নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া

সুরুচিবালা রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
মাঘ, ১৩৬৮
জানুয়ারী—১৯৬১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

পুতুল ও বুলুকে

মা

আমাদের কয়েকটি ধর্মীয় প্রকাশন

ভক্তের ভগবান (১ম ও ২য়)
ডানপিটে ভগবান
ছোটদের পদ্মাপুরাণ
শেষ প্রণাম
সাধক কমলাকান্ত
স্বামী নিগমানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী
গল্পে বিবেকানন্দ
গল্পে নিবেদিতা
শ্রীমা
বাউল রাজার প্রেম
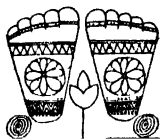
এক

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে।

নবদ্বীপের পথ-ঘাট সদ্য ঘুমভাঙা কণ্ঠের অস্পষ্ট মৃদুগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছে। গঙ্গাস্নানে পুণ্যকামীদের গঙ্গাস্তব উচ্চারণ শান্ত গম্ভীর ভক্তিময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তরুণ সূর্যের আবির্ভাবে আলোকময় হয়ে উঠল বিশ্ব চরাচর। স্নানার্থীর ভিড় ক্রমে বেড়ে উঠল। আবিররাঙা গঙ্গার বুকে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে কয়েকটি কিশোরী। স্নান সেরে ঘাটে বসে পূজা করতে করতে শচীদেবীর মুগ্ধ দৃষ্টি বার বার ওদের উপর পড়ে, লক্ষ্মী-প্রতিমার মত সরলা কিশোরীগুলি আলো করে আছে গঙ্গার বুক।

স্নান সেরে ঘাটে উঠে পূজারতা শচীদেবীর পায়ে প্রণাম করে মেয়েরা বাড়ি ফিরে যায়।

শচীমাও আশীর্বাদ করেন মেয়েদের।

কিন্তু একটি মেয়েকে দেখে শচীমায়ের দৃষ্টি আর ফেরে না। একদিন মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াতেই শচীমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আশীর্বাদ করলেন—

'যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমায় করুন প্রসাদ।'

মেয়েটি সলজ্জভাবে প্রণাম করে, কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। শচীদেবী তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 'বাবা সনাতন মিশ্র, মাতা যোগমায়া', পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন শচীদেবী; তারপর যখন নিজের নাম সে বলল 'বিষ্ণুপ্রিয়া', তখন শচীদেবী আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া! কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। তাঁর পুত্রকেও যে সকলে বিষ্ণুর

অবতার বলেই মনে করে। তাহলে, এই মেয়েটিই ত তাঁর পুত্রের যোগ্য বধ্ হতে পারে! মনের একান্ত আবেগে কামনা করলেন—

'এ কন্যা আমার পুত্রের হউক ঘটন'—

শচীদেবী ভাবলেন, কদ্দিন থেকেই এই মেয়েটিকে দেখে বুকের ভিতরে তাঁর কি যে স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, সে কি এই কারণেই ?

বিষ্ণুপ্রিয়া! এ কন্যা তাঁরই পুত্রের জন্য!

শচীদেবীর আর বিলম্ব সয় না। একদিন তাই তিনি গঙ্গাদেবীকে সাক্ষী রেখে এই পরম রূপলাবণ্যবতী কিশোরীকে তাঁর একান্ত আপনার করে নিলেন। মনে মনে ভাবলেন, মা গঙ্গা সাক্ষী রইলেন, আর ভাবনা কি ? শচীদেবীর আর বিলম্ব করলেন না। বাড়ি ফিরেই তিনি ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠালেন এবং ভগবান বিষ্ণুর নিকট মনের সমস্ত কামনা নিবেদন করে অধীর আগ্রহে সুখবরের প্রতীক্ষায় রইলেন। যথাসময়ে সে খবরও তাঁর মিলল।

* * * *

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে, প্রতি টোলে টোলে সেদিন দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন চলছে। বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর আরাধনা। টোলের পণ্ডিতরা ভক্তিনত প্রাণে একান্তভাবে দেবীর ধ্যানে মগ্ন।

সহসা সমস্ত শহরে কেমন করে রটে গেল রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের প্রাসাদে দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় দেবী সরস্বতী সনাতন মিশ্রের কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। দলে দলে শহরের লোক ছুটে চলল দেবীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়; পণ্ডিতেরা স্তব করতে লাগলেন দেবীর।

কৃতার্থ হয়ে গেলেন রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং তাঁর পত্নী যোগমায়া দেবী। ভক্তিনত প্রাণে তাঁরা বিষ্ণুর চরণে নিবেদন করে দিলেন কন্যাকে। ছোট্ট শিশুটি জন্ম মুহূর্তেই সমর্পিতা হয়ে গেল বিষ্ণুর চরণে।

শিশু দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বড় হয়ে উঠতে লাগল। পিতামাতা কন্যার নামকরণ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। মায়ের কোল ছেড়ে ক্রমে ক্রমে

সমবয়স্ক সাথীদের সঙ্গে তার খেলা শুরু হল। সখিরা আদর করে ডাকত প্রিয়াজী। সবচেয়ে প্রিয় ছিল মেয়েদের পূজো পূজো খেলা।

তারপর শৈশব কেটে গিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করল বিষ্ণুপ্রিয়া। খেলাঘরের পূজোও শেষ হল। পিতা তখন কন্যার হাতে ঠাকুর ঘরের সমস্ত ভার তুলে দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও পরম ভক্তিভরে সে ভার তুলে নিল মাথায়।

একে একে শচীদেবীর কানে সকল খবরই এল। পুলকে বিস্ময়ে শচীদেবী ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন। কাশী মিশ্রকে পাঠালেন সনাতন মিশ্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। পুত্রের কাছেও সে কথা উত্থাপন করলেন।

মাতার মতের বিপক্ষে নিমাই কখনও কথা বলে না, এবারেও বলল না। মায়ের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, সুতরাং বিয়েতে কোন বাধাই রইল না।

নদীয়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস মিশ্রের পুত্র রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র সম্ভ্রান্ত বিত্তবান গৃহস্থ। কাশী মিশ্র তাঁর গৃহে এসে নিমাইয়ের পরিচয় জ্ঞাপন করে, শচীদেবীর আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন—

'তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি
তাঁহাব উচিত পত্নী এই মহাসতী।'

ঘটক কাশী মিশ্র নানাভাবে নিমাইয়ের প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন, শোন সনাতন মিশ্র, মহাভারতের কাহিনী তো জান, দ্বাপরে একদিন দেবী রুক্মিনীর বিয়ে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। সেই অপূর্ব যোগাযোগ দেখে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর যোগ্য পত্নীকে। তেমনি তোমার কন্যার বিয়ে হবে নিমাইয়ের সঙ্গে। এটাও দেবতা ও মানুষ সকলেরই অভিপ্রায়। তুমি একথা ভেবে দেখ এবং সত্বর বিবাহের আয়োজন কর। শোন সনাতন মিশ্র, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার কন্যার স্বামী নিমাই পণ্ডিত। সুতরাং তুমি আর দ্বিধা করো না।

কন্যা বড় হয়েছে, তার বিবাহের কথা সনাতন মিশ্র ভাবছেন মনে মনে, এমন সময়ে এই প্রস্তাব! সনাতন মিশ্র ভাবিত হলেন, আবার ঘটকের ঘটকোচিত চতুর বচনে কৌতুকও করলেন। মৃদু হেসে বললেন,

—নিমাই পণ্ডিতের কথা আমি শুনেছি। কোন এক কাশ্মিরী পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে নিমাইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। শুনেছি সবই। আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব।

পত্নী যোগমায়ার সঙ্গে পরামর্শ করে, একদিন স্বচক্ষে নিমাইকে দেখতে গেলেন সনাতন মিশ্র। যা দেখলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন। স্নানান্তে পূজো শেষ করে নিমাই যখন অন্দরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে, কাশী মিশ্রের সঙ্গে সনাতন মিশ্র এসে তখনই প্রবেশ করলেন এবং নিমাইয়ের সেই পবিত্র দেবদুর্লভ চেহারাখানি দেখে চমৎকৃত হলেন। মনে হল, নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ দিয়ে কি এক অপূর্ব তেজ স্ফুরিত হচ্ছে, চক্ষুদুটিতে কেমন যেন একটা অপার্থিব পবিত্রতার ছায়া! সনাতন মিশ্রের মনে হল, এ যেন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত একটা দেবমূর্তি!

অবশেষে দু'পক্ষেরই আলোচনার শেষে বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। বিষ্ণুপ্রিয়ার কানেও এল তার বিয়ের খবর। অতি শৈশব থেকেই মন-প্রাণ তার যে শ্রীবিষ্ণুর পায়েই সমর্পিত হয়ে আছে। বিয়ের ভাবনায় তাই তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এ জীবন মন আর কাকে সে নিবেদন করবে! দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে সে জানাল তার যত ভাবনা ঠাকুরের পায়ে। পূজা শেষে যখন উঠে বসল, অনুভব করল, ঠাকুরের প্রসন্ন হাসি আলোকিত করে দিয়েছে তার বক্ষ।

তারপর একদিন মা-ও ব্যক্ত করলেন তার কাছে নিমাইয়ের কথা। সলজ্জ শান্ত মুখে সে শুনল সব, কিন্তু উত্তর দিল না।

এমন সময়, একদিন সকালে সখিদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় সহসা চোখে পড়ল, এক ভুবনমোহন অতুলনীয় রূপবান যুবককে। সখিরা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, এই সেই নিমাই পণ্ডিত। চিনতে দেরি হল না বিষ্ণুপ্রিয়ারও, এই-ই ত সেই নিমাই পণ্ডিত, যার চাপল্য, যার রূপ, যার পাণ্ডিত্য সারা নবদ্বীপে আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে। মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর পায়ে অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বিনম্র হৃদয়ে সকল ভক্তি প্রীতি নিবেদন করে দিল এক মহামানবের পায়ে।

চমকিত হল নিমাইও। পথে চলতে চলতে সহসা এ কাকে দেখল শ্রীগৌরাঙ্গ। চিনতে বাকি রইল না বিষ্ণুপ্রিয়াকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন পথের মাঝে। মনে পড়ল, বহু যুগ আগের কোন

স্মৃতি ? বুকের ভিতর একটা আলোড়ন উঠতে লাগল। কোথায় ? কোথায় কত দূরে তর্‌তর্‌ করে বয়ে যাওয়া যমুনার কালো জল, মনে কি পড়ছে কোন্‌ কদম্বমূলের বংশীবাদন ?

কত যুগ-যুগান্তের ওপার থেকে একটা কিসের সাড়া যেন ভেসে আসছে বুকের ভিতর। কি যেন অস্পষ্ট একটা—কিন্তু অন্ধকার—অন্ধকার সব।

সমস্ত নবদ্বীপ শহর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নিমাইয়ের বিয়ের সংবাদে।

রাজা বুদ্ধিমন্ত খান খবর পেয়েই শচীদেবীর বাড়ি এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন,—মা, আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি, আমার নিমাই দাদার বিয়ের সমস্ত খরচ আমি বহন করব। ঐ যে একখানা লাল পেড়ে শাড়ি আর শাঁখা দিয়ে বউকে বরণ করে ঘরে তুলবে, তা আমি হতে দেব না, এমন বিয়ে আমি দেব নিমাইয়ের যা নবদ্বীপ শহরে কেউ কখনো দেখেনি।

স্যাকরা এল, তাঁতী এল, সবারই মুখে এক কথা—মা, সনাতন মিশ্র বড়লোক। কিন্তু আমাদের নিমাই-ই কি গরিব না কি মা ? আমরা এমন করে বউকে আর নিমাইকে সাজিয়ে দেব যে সনাতন মিশ্র আর তার আত্মীয়রা অবাক হয়ে যাবে।

বিবাহের দিন স্থির হল। গোধূলি-লগ্নে নিমাইয়ের বিয়ে। নবদ্বীপবাসীর গীত-বাদ্যে, নৃত্যে মুখরিত হয়ে উঠল সারা শহর। ব্রাহ্মণগণের সুমঙ্গল বেদধ্বনির উচ্চারণে বিবাহ বাসর অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। ভাটগণের গানে আকৃষ্ট হল নিমন্ত্রিতরা। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি আর উলুতে ও নারীদের হাস্যকৌতুকে, রঙ্গে-রসে মধুময় হয়ে উঠল সনাতন পণ্ডিতের প্রাসাদ।

স্তোত্র এবং বেদধ্বনির ভিতরে দোলা থেকে নামান হল বরকে। সনাতনপত্নী লাল রেশমী শাড়ি পরে জামাতাকে বরণ করে নিলেন ধান্য-দূর্বা দিয়ে। সপ্তঘৃতের প্রদীপে করলেন আরতি। বিবাহ আরম্ভ হল—

'আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে,
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।'

বধূ ঘরে এল।

তু'পাশে বিমুগ্ধ জনতার হর্ষধ্বনির মাঝখান দিয়ে গৌরাঙ্গ তাঁর নব-পরিণীতা বধূকে গৃহে নিয়ে চললেন। শচীদেবীর সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি আর আজ ক্ষুদ্র রইল না। অগণিত শুভার্থিনী এবং শচীদেবীর প্রীতিমুগ্ধ রমণীরা পালকি থেকে নামিয়ে নিলেন বর বধূকে, উলু ও শঙ্খ-ধ্বনিতে পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল। পুলকিত শচীদেবী পুত্র এবং বধূকে নিয়ে ঠাকুর ঘরে শ্রীবিষ্ণুর পায়ে ভক্তি নিবেদন করবার জন্যে নিয়ে গেলেন।

বধূ ঘরে এসেছে।

পুরানো অবসন্নতার শেষে গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন নতুন সজীবতার আভাস। নতুন জীবন, নতুন অনুভূতি। বধূ সংসারের কাজে ঘুরে বেড়ায় এঘরে, ওঘরে। শচীদেবী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। বধূর সমস্ত কাজে যেন পবিত্রতা ঝরে পড়ে। তার নরম-কোমল হাত তুখানির স্পর্শে সংসারের সকল কাজে যেন মঙ্গলময় আনন্দের আভাস।

প্রসন্ন মনে প্রসন্ন মুখে শচীদেবী তাকিয়ে দেখেন গৃহের নতুন রূপ। বাগানের গাছগুলি নতুন হাতের স্নেহবারি সিঞ্চনে নতুন শাখা-প্রশাখা মেলে সজীব হয়ে উঠেছে। কচিপাতায় ফুলে ফলে তাদের বুকে জেগেছে রোমাঞ্চ। গৃহপালিত পশু-পক্ষিগুলি, গোয়ালে গাভীটি নতুন হাতের যত্নে সকলেই পরিপুষ্ট, সকলেই প্রসন্ন। মায়ের প্রসন্নতায় পুত্রের মুখও প্রসন্ন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বধূর মুখের প্রসন্নতাও নীরবে নিরীক্ষণ করেন মা।

এই একটি কিশোরীর আবির্ভাব যেমন করে এই নির্জীব গৃহখানির প্রাণশিখাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলল, মাতা ও পুত্র উভয়েরই কাছে এ একটি পরম বিস্ময়।

নিমাইয়ের জীবন আগের মতনই চলছে। সেই শাস্ত্রালোচনা, সেই টোলের পাঠগ্রহণ, মায়ের সঙ্গে সংসার নিয়ে আলোচনা, স্বভাব আগেরই মতন তেমনই চঞ্চল, তেমনই উদ্ধত। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে বধূর সঙ্গে রহস্যালাপও চলে একটু একটু। সোহাগে, আদরে নতুন জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

দুই

মনের ভেতর কিসের যেন আহ্বান শুনতে পেলেন নিমাই। উচ্চতর কোন নূতন জীবনে দীক্ষা নেবার আহ্বান কি? এত কালের হাসিখুশী ভরা পুরানো অভ্যাস এবং দিনগুলোকে ছিন্নবস্ত্রের মত ধুলোয় পরিত্যাগ করে এক গভীর বেদনাময় জীবনে প্রবেশের আহ্বান কি?

গয়াতে ঈশ্বরপুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন নিমাই। পুত্রের পানে তাকিয়ে প্রমাদ গণলেন মাতা। তবে কি ভবিতব্যের ফল খণ্ডন করা যায় না? বেদনাভরা কণ্ঠে, অশ্রুসিক্ত নয়নে কেঁদে বললেন—কি হয়েছে বাবা?

অশ্রুসিক্ত নয়নে বিহ্বল নিমাই কাতর কণ্ঠে বলে,—'মাগো,

কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়
হাতছানি দিয়ে মোরে বলে আয়, আয়।'

মাতা কেঁদে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে, বধূকে কাছে ডেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে, কেঁদে বলেন,—বৌমা, আমাদের দুঃখের দিন এল, তুমিই পারবে ওকে ঘরে টেনে রাখতে,—গয়াতে গিয়ে কি হয়েছে কে জানে, তুমি ভুলিয়ে দাও ওকে সব।

কিশোরী বধূর উত্তর দেবার কি আছে! হতভম্ব স্তম্ভিত হয়ে, নতনেত্রে সে বসে থাকে শাশুড়ীর পাশে। বিবাহিত জীবনে স্বামীসঙ্গ সে বেশী পায় না সত্য কিন্তু যতটুকু পায়, অকৃত্রিম মাধুর্যে তাই যেন অনুপম। তারও কি অবসান ঘটেছে?

প্রভাত থেকে সারা দিন-রাত স্বামীর একই আচ্ছন্ন অবস্থা, মুদিত নয়নের দুই পাশ দিয়ে ধারা বয়ে চলেছে, তাকালে বুক ফেটে যায়।

হায়রে, কে সেই বংশীবাদক শিশু, যার টানে নিমাই আর সকল কিছুই ভুলে গেল ? ভুলে গেল মাতাকে, ভুলে গেল প্রিয়াকে, ভুলে গেল তার টোল ও শিষ্যদের ! মাতা বধূ ও নবদ্বীপের যত ভক্তরা বিষন্ন মনে লক্ষ্য করতে লাগল নিমাইয়ের অবস্থা।

নিমাইয়ের এই সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষের গূঢ় কারণটি বড়ই বেদনাদায়ক। সংসারে যারা বীতস্পৃহ হয়, সন্ন্যাস তারাই গ্রহণ করে। নিমাইয়ের তো সে অবস্থা নয় ! এত স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, রূপ সংসারে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? ঘরে তার স্নেহময়ী মাতা প্রেমময়ী পত্নী, স্বচ্ছল অবস্থা, বন্ধু ও ভক্তগণের প্রীতি, জীবনে ত তার কোন অভাব ছিল না !

মনস্থির হয়েই গেছে, তথাপি রয়েছে সংসারের প্রতি গভীর মমত্ব-বোধ। নিমাইকে কিছুদিনের জন্য নিজের মনোভাব সংহত করে নিতে হল।

নিমাইয়ের মনের ভিতর যে কি আলোড়ন চলছে, মা তা জানলেন না। পুত্র যে সাধারণ মানুষের মতই সংসারী হয়ে উঠেছে, এতেই মাতা পুলকিত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বধূকে ডেকে বললেন—বউমা, নিমাই যেন আমাদের কোন রকম ব্যবহারেই ব্যথা না পায়, সেই চেষ্টাই কর মা।

বধূ নতনেত্রেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

মাতা ও পত্নীর আনন্দ দেখে নিজের মনোভাব গোপন রেখে, গৃহস্থালী সম্বন্ধে সহসা যেন অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠলেন নিমাই।

সংসারের সকল অভাব অভিযোগ দূর হয়ে গেল, সকল রকম দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মায়ের মুখে এখন সদাই হাসি।

দিন সচ্ছল গতিতেই চলে যাচ্ছে, তবু, মাঝে মাঝে শয্যায় শুয়ে বিনিদ্র রাত্রির অসংখ্য ভাবনার ভিতরেও শৈশবের কথা মনে পড়ে যায় নিমাইয়ের—

গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ফুল, মালা, নৈবেদ্যর থালা নিয়ে পূজো করেন মহিলারা। ফুল, মালা, নৈবেদ্যর থালা নিয়ে পূজো করে কিশোরীরাও। নিমাইয়ের সেই মালা ও নৈবেদ্যর উপর বড় লোভ। থালার উপর থেকে মালা তুলে নিয়ে গলায় পরে নিমাই, নৈবেদ্য ছড়িয়ে ফেলে চার পাশে।

মহিলারা বিরক্ত হন, কিশোরীরা মিনতি করে,—অস্থির হয়ে ওঠেন শচীদেবী। এই দুরন্ত ছেলেকে যে কিছুতেই সামলানো যায় না। ঘরে বন্ধ করে রেখে এলেও কি করে সে বাঁধন খুলে পালিয়ে আসে। কিন্তু তবুও যখন এই দুরন্ত শিশুই গলায় মালা পরে নৈবেদ্যর থালা সম্মুখে নিয়ে বসে, তখন তাকে যে কি অপরূপ দেখায়, অবাক হয়ে মায়ের দল তাকিয়ে তা দেখেন, কেউ-কেউ আস্তে আস্তে বলেন,—ওকে দেখে কি যে মনে হয় ভাই, ওকি বালগোপাল? তারপরেই সকলের হরিবোল ধ্বনির মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটি দেবশিশুর মতই হাসিহাসি মুখে উঠে চলে যায় নিমাই।

এমন পাগল ছেলেকে নিয়ে শচীদেবীর চিন্তার আর অন্ত নেই, কে কি বলবে, কে কি ভাববে, কে যে বিরক্ত হয়ে উঠবে, সেই ভাবনায় মায়ের মন সদাই অস্থির।

শ্রীবাসপত্নী মালিনীদেবী শচীদেবীর সখি। তিনি শচীদেবীকে বলেন—কিছু ভাবনা কর না বোন, তোমার ছেলের সর্বাঙ্গে যে কত সুলক্ষণ, ভালো করে তাকিয়ে দেখ। আচার্য-অদ্বৈত-প্রভু বলেছেন, দেবতার অংশে ওর জন্ম, ও সাধারণ ছেলে নয়, বড় হয়ে ও দিগ্বজয় করে বেড়াবে। তুমি ধন্য হবে গো শচী, ধন্য হবে তোমার পিতৃ-মাতৃকুল, আর ধন্য আমরাও, যারা ওর কচি বয়েস থেকেই এই সব লীলাখেলা দেখছি।

শচীর মনের আশঙ্কা তাতে আরও বাড়ে, মনে হতে থাকে কত কথা। আটটি কন্যার মৃত্যুর পরে জন্ম হয় বিশ্বরূপের। সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাস নিয়ে যে চলে গেল, তারপর এই ছেলেও যদি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে যায়, তাহলে আর সান্ত্বনা পাবার কি থাকবে!

মনে পড়ে শিশুর জন্মের পর শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী গণনা করে বলেছিলেন,

—'মহাপুরুষের চিহ্ন, সর্ব অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, দেখি এই তারিবে সংসার'

শচীদেবীর আশঙ্কা দিনে দিনে বাড়তেই থাকে, কমে না।

সেটা একটা ভাঙ্গাগড়ার যুগ। দ্বন্দ্ব. সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র, রাজপুরুষদের অত্যাচার বাংলার সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। হিন্দু সমাজের নীচুতলার মানুষ, উপরের তলার দর্পিত মানুষদের কাছে পশুর মত ব্যবহার পেতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সামাজিক বা মানবিক

কোন অধিকারই সেদিন তাদের ছিল না। অবিচারে অত্যাচারে তাদের অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আবেদনের কাছে, সকল রকম সুযোগের আকর্ষণ তাদের লুব্ধ করে দিল এবং দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।

হিন্দু সমাজের সেদিন একটা নৈরাশ্যজনক অবক্ষয়ের দিন! প্রেমহীন, প্রীতিহীন, ভক্তিহীন নীচুতলার তমসাচ্ছন্ন মানুষগুলো সমাজের উচ্চবর্ণের প্রতি গভীর বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, তাই দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেঁচে গেল তারা।

দেশের সেই অধোগতির দিনে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঘন মেঘের নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর আশার আলোক হাতে আবির্ভাব হল শ্রীচৈতন্য দেবের। অত্যাচার এবং কদাচারের আবর্তে পড়ে বাংলার যে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, তাঁর আবির্ভাবে সে প্রাণশিখা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাঁর আহ্বানে মৃত্যুর গহ্বর থেকে জীবনের পানে ফিরে তাকাল বাঙ্গালী। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর জাগরণ এল দেশে। নব-জীবনের দ্যোতক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সে জন্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ সেদিন আর রইল না। সেদিন পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, ধনী-নির্ধন, সকল ভারতবাসীকে সেবা ও প্রেমের এক নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দান করলেন শ্রীচৈতন্য। সমাজের উঁচু ও নীচুস্তরের মানুষকে বৈষম্য ভুলিয়ে একই আসনের নীচে এনে দাঁড় করালেন তিনি।

শচীর মনের কোণে নিমাইয়ের ছেলেবেলাকার সকল কিছুই যেন আজও তেমনই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তারপর তো নিমাই বড় হয়েছে, জীবনে তার অনেক কিছু ঘটেছে, কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিমাইয়ের দিন এবং রাতগুলো কেটে যাচ্ছে। অতি সংগোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে শচীদেবী সকলই লক্ষ্য করে চলেছেন। মনের ভিতর তাঁর কখনো আশা, কখনো বা নৈরাশ্য চলেছে পাশে পাশে।

শচীদেবী জানেন না, তাঁর নিমাই তো তাঁর একলার নয়, ধরিত্রীর অন্তর রাজ্যে নিমাইকে নিয়ে কি যে রহস্যের লীলা চলেছে, শচীর

তা তো জানা নেই। সমস্ত বিশ্ব যাঁর চরণস্পর্শে মুক্তির জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, তাঁর একলার ঘরে তাঁকে তিনি বেঁধে রাখবেন কি করে!

সেই ভীষণ সর্বনেশে দিনেরও দেরি নেই। নিমাইয়ের মনও তারই জন্য প্রস্তুত। তবু তিনি ভোলেন নি এই সংসারের উপর তাঁর কর্তব্য। মাতা পত্নীকে যতটুকু আনন্দ দেওয়া তাঁর সম্ভব, সে বিষয়ে তিনি ত্রুটি করবেন না।

সমস্ত কাজের ভিতরে ও বুকের ভিতর তিনি যে কার চরণধ্বনি শুনতে পান, ঠিক তা বুঝতে পারেন না। পূজোয় যখন বসেন, ধ্যানের ভিতর কি একটা অস্পষ্ট ছায়া তাঁর মুদিত চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, পরিষ্কার ভাবে তিনি তাঁকে দেখতে পান না, মন তাঁর আকুল হয়ে থাকে।

প্রফুল্ল পদ্মের মত আয়ত যাঁর বর্ণ, বাঁশীর সুরে যিনি অনুক্ষণ ডেকে চলেছেন ধরণীর সুখী দুঃখী ধনী দরিদ্র সকলকে, তাঁকেই দেখতে পান নিমাই, বুকের ভিতরে তাঁরই বাঁশরীর ডাক।

'কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়
হাতছানি দিয়ে মোরে ডাকে আয় আয়।'

নিমাইয়ের মন এক একবার চঞ্চল হয়ে ওঠে, মন বলে – যাই, যাই, এই যে আসছি। সেই বহুযুগের ওপার থেকে বৃন্দাবনের বাঁশরীই যে ডাকছে নিমাইকে!—গৃহীর কর্তব্য এখনো যে শেষ হয়নি। তারপর যাব, দুঃখের বন্ধুর পথ পার হয়ে যাব, যাব অন্ধকার থেকে আলোয় মৃত্যুহীন জ্যোতির্ময় পথে। বুকের ভিতর বাঁশী অবিরাম ডেকে চলেছে, ধ্বনিত হয়ে উঠছে অসীমের মন্ত্র!

তাঁর মনের এই ভাব বুঝতে পেরে আচার্য অদ্বৈতাচার্য বলেন,—প্রভু, দ্বাপর আর কলির সন্ধিক্ষণে স্বয়ং ভগবান সশরীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভগবান নিজে বলেছিলেন—যখন ধর্মের গ্লানি হয়, যখন অন্যায়, অধর্ম, পাপ প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে, তখনই আমি শরীর ধারণ করি। কেন তা শোন—

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

ধর্মের আদর্শ সাধনাকে অবহেলা করাই অধর্ম। এই অধর্ম যখন প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করে, সমাজে তখনই নানারকম গ্লানি আসে।

অত্যাচার উৎপীড়ন তখনই দেশকে ধ্বংস করে দেয়। সেই বিনাশ থেকে রক্ষা করবার জন্যই ভগবানের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীর এখন সেই দুর্দশার দিন। আমরা মনে করি তোমার মধ্যেই ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এই দেশকে এখন তুমি রক্ষা কর। নাস্তিক আর অবিশ্বাসী মানুষে ভরে গেছে দেশে, তাদের শিক্ষা দাও। অত্যাচারী উৎপীড়ক যারা তাদের মনের পরিবর্তন সাধন কর। প্রভু, সেদিনের সুদর্শন চক্রের ঝংকার বেজে উঠুক তোমার কীর্তনে। তোমার নামগানে ধ্বনিত হউক পাঞ্চজন্য নাদ। জ্ঞানে, ধর্মে, ত্যাগে, শিক্ষায়, কর্মে অতুলনীয় হয়ে উঠুক বাঙ্গালী এবং বিশ্বের মানুষ।

প্রভু, শুধু সন্ন্যাস বা শুধু গার্হস্থ্য ধর্ম নয়, জয়ের যে অপূর্ব সম্মেলন, তারই সম্মোহন রূপে একদিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন মানুষের সম্মুখে। সেই যে প্রচণ্ড কর্মোদ্যোম ও মানসিক প্রশান্তি, তাই নিয়েই তুমি আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও।

নিমাই তন্ময় হয়ে মুদিত নয়নে বুকের ভেতর কিসের একটা শিহরণ অনুভব করেন। কিসের যেন একটা আভাস পেতে চান। একটা আলো জ্বলে উঠছে বুকের ভিতর। বাণী ধ্বনিত হচ্ছে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

কত রকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিমাইয়ের জীবন চলেছে।

দিন বদলের পালা চলেছে অবিরত। রাত্রি শেষের ঝিরঝিরে হাওয়া জানালার ভিতর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে ধীরে ধীরে। হালকা হয়ে আসছে অন্ধকার।

নিমাইয়ের শয্যাপার্শ্বের জানালায় দুটো শালিক এমনই সময়ে রোজ এসে জাগিয়ে দেয় ওদের। ভগবানের দূত ওরা। জেগে উঠে বসল ওরা শয্যার উপর। হাসল বিষ্ণুপ্রিয়া,—ও মা, কখন সকাল হল।! ঘুম ভেঙ্গেছে, কিন্তু চোখের পাতায় নিদ্রাসুখের আমেজটুকু মিলায়নি তখনো বিষ্ণুপ্রিয়ার—মা উঠেছেন না কি ?

—মা কখন গঙ্গাস্নানে চলে গেছেন, আমি সাড়া পেয়েছি মায়ের।

—আমায় ডাকলে না কেন ?

—ঐ যে তোমার ছেলে তোমায় ডাকছে।

দরজার ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল,—বউমা, ও বউমা—

—কি দুষ্টু হয়েছে কাকাতুয়াটা, সারাদিন 'বৌমা' 'বৌমা' করবে।

—তোমায় ভালোবাসে যে, এখন তোমার সাড়া পেয়েই তো অমনি ডেকে উঠল।

দু-চারটি মিষ্টি কথা, দু-চারটি দৈনন্দিন কাজের মিষ্টি উপদেশ—সারাদিনের খোরাক নিয়ে পুলকিত মনে বেরিয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিমাই গাত্রোত্থান করে উঠে বসলেন, এবং কর্পূর সুবাসিত জলে মুখ প্রক্ষালন করে আসনে বসে ধ্যান করতে লাগলেন।

গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে এসে শচীদেবী দেখতে এলেন পুত্রকে। পুত্রের এই ধ্যানমগ্ন মূর্তি তাঁকে ভাবিত করে তোলে। তাঁর পুত্রকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন কোন্ দেবতা? একটা জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রতিদিন একই দৃশ্য ব্যাকুল করে তোলে মায়ের মনকে। ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি ডেকে ওঠেন—নিমাই, নিমাই।

মুদিত চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত করে নিমাই তাকান মায়ের দিকে। প্রশান্ত হাসিতে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে উঠে এসে মায়ের চরণ-বন্দনা করেন নিমাই।

দূরে গ্রামের পথে গোচরণে চলেছে গরুর দল, রাখাল ছেলেদের বাঁশীর শব্দ ভেসে আসে কানে। মায়ের মনটা কেমন উতলা হয়ে যায়। দূরে কত দূরে মাঠের পথে চলে যায় ওরা। গানের শেষ রেশটুকু ভাসতে থাকে কানের দরজায়—

—মাগো, গগনে বেলা হোল,
বাঁধা গাই দেখতে পাই,
কৃষ্ণ ধনকে সাজায়ে দাও মা,
গোষ্ঠে যাই।
গোষ্ঠে যদি নেওরে বলাই
কৃষ্ণ ধনকে,
বলাই, রাখিয়ো যতনে,
ওরে, কংসের চর সদা ফেরে বনে,
কত ভয় যে জাগে মনে,
ওরে অভাগিনীর নীল রতন যায় বনে,
বলাই রাখিয়ো যতনে।

মায়ের বুক ব্যাথায় ভরে ওঠে। কত যুগ আগের যশোদার ব্যথা শচীর বুকটা চিরে দিয়ে যায়। মা তাঁর পাগল ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মোছেন।

খিড়কি-দুয়ার ঠেলে দুটি কিশোরী এসে প্রবেশ করল আঙ্গিনায়, ডেকে উঠল,—প্রিয়া, ও বিষ্ণুপ্রিয়া! মাগো, তোমার বউমা কোথায়?

—এই তো ঘরদোর নিকোনো ওর হয়ে গেছে। গোবর ছড়া দিতে দিতে পুকুর পাড়ে গেল দেখলাম, এক্ষুণি আসবে, একটু দাঁড়া মা তোরা, আসছে ও।

কলসী কাঁখে মেয়েরা পুকুরের দিকে চলল। গোবর ছড়া দিতে দিতে বিষ্ণুপ্রিয়া হেসে ওদের দিকে তাকাল।

—কাঞ্চন, অমিতা, এসেছিস? এই যে হয়ে গেছে ভাই।

রোদ উঠছে—রাঙা হয়ে উঠছে আকাশ, ঝিলমিলিয়ে উঠছে সূর্যিঠাকুর। কলসী কাঁখে তরুণী তিনটি বেরিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। শঙ্খ-চক্র মুখরিত উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রথম সূর্যকিরণ স্পর্শে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুময়। রক্তিম উষার মিঠেলী হাওয়ায় কোমল হয়ে উঠল মেয়েদের মন। সখীরা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

এদিকে ধ্যানরত নিমাইকে বেষ্টন করে বসেছেন শ্রী অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস। এসেছেন হরিদাস, মুকুন্দমুরারী প্রভৃতি। ধীরে ধীরে প্রভাতী সুরে কীর্তন আরম্ভ হল, কীর্তন শোনবার জন্য কত লোক এসে ভরে গেল শচীদেবীর ঘর আঙ্গিনা সব, এলেন এ-বাড়ি ও-বাড়ির মেয়েরাও। সকলের দৃষ্টি ভাবে আচ্ছন্ন ঐ একটি মানুষের দিকে। সেদিনের সেই দুষ্টু চপল নিমাইয়ের এত পরিবর্তন হল কি করে! কি অপরূপ জ্যোতির্ময় চেহারা!

বেলা বাড়তে লাগল, সূর্যিঠাকুরের প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। শচীদেবীর নির্দেশে সকলে চললেন গঙ্গাস্নানে। তখন নিমাইয়ের আবার অন্য রূপ, প্রফুল্ল কমলের মত হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার বুকে।

'গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর,
তবে স্নান করি প্রভু ভক্তজন সঙ্গে,
সুরধনী তটে উঠেল বহুরঙ্গে।'

গৃহে প্রতীক্ষা করছেন শচীদেবী। স্নানসিক্ত চন্দনচর্চিত দেহে পুত্র এসে পূজোর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তারপর অঙ্গনের তুলসী-গাছটাতে জল দিয়ে মাকে প্রণাম করলেন। পূজোয় নিবেদিত ফল-ফুল ও প্রসাদ পুত্রের হাতে দিয়ে মা আশীর্বাদ করলেন ছেলেকে। পূজোর ভোগ তৈরি হচ্ছে তখনও, নিমাই নিজ মন্দিরে প্রবেশ করে ধ্যানে বসলেন।

অন্নভোগ গ্রহণ করবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন শচীমা। শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস এবং আরো সকলের সঙ্গে বসে, রহস্যালাপ করতে করতে নিমাই ভোজন সমাপন করেন। শচীদেবীর সখিরা শ্রীবাসপত্নী মালিনীদেবী, শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতা ঠাকুরাণী সকলে ভক্তদের সেই নির্মল আনন্দ দেখে পুলকিত হন। আড়ালে বসে অবগুণ্ঠনবতী বিষ্ণুপ্রিয়াও পুলকিত মনে স্বামীর সেই আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে। প্রসাদ গ্রহণের জন্য শচীদেবীর গৃহে ভক্তদের প্রত্যহই নিমন্ত্রণ। সন্তুষ্ট মনে পরিতৃপ্তির সঙ্গে সকলে সে প্রসাদ গ্রহণ করেন। তারপরের মুহূর্ত কয়টির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া।

তার পরের মুহূর্ত ক'টির জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। তার এই দেশ বিখ্যাত স্বামী, যার একটা কথা শোনবার জন্য, একটুখানি প্রসন্ন হাসি দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে সকলে, তারই একটুখানি গোপন সান্নিধ্য। যেখানে আর কেউ নেই, কেবল ওরাই দু'জনে পরস্পরের একান্ত আপনার। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই মুহূর্ত ক'টির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে।

আহারান্তে নিমাই চলে গেলেন আপন মন্দিরে। শাশুড়ীর নির্দেশে বিষ্ণুপ্রিয়া সহস্তে রচিত সুগন্ধি তাম্বুল নিয়ে গেল স্বামীর জন্যে। হাত পেতে পুলকিত নিমাই গ্রহণ করলেন সে তাম্বুল, একটু স্মিত হাসি, দু-চারটি রহস্যালাপ, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে তাই পরম লাভ।

একটু বিশ্রাম করতে করতেই কেটে গেল দিনের মধ্যপ্রহর। শেষ

হয়ে এল দিন, সূর্য অস্ত গেল পশ্চিম আকাশে। ধুনুচিতে সুগন্ধি ধূপে আগুন দিয়ে ঘরে ঘরে বধূরা তুলসীতলায় এলো প্রণাম করতে। তাদের কোমল হস্তের সন্ধ্যা-দীপের আলোয়, আর ধূনোর সুগন্ধে মঙ্গলময় হয়ে উঠল গৃহস্থের সংসার।

বহির্বাটীতে পাড়ার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকরা এসে ভিড় করে বসেছেন এক্ষুণি পাঠ শুরু হবে সেই আশায়। ধৌতবস্ত্র পরিহিত নিমাই এসে বসলেন আসনে। তারপর সুললিত মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে— শুরু করলেন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। ক্রমে ক্রমে অগণিত শ্রোতায় ভরে গেল বহির্বাটী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, পাঠ সাঙ্গ করলেন নিমাই। তারপর সকলে কীর্তন করতে করতে চললেন গঙ্গাতীরে।

গঙ্গার পারে কেয়াকাঁটায় ভরা সাধারণের অগোচরে, প্রকৃতির আপন খেয়ালে রচিত অতি মনোরম একটি উপবন। কদম গাছ আর বনফুলের মিষ্টি গন্ধে প্রকৃতি পরম যত্নে যেন এটিকে সাজিয়ে রাখেন দিনের পর দিন। পদতলে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, যেন কার পদস্পর্শের আশায় মৌন শান্ত প্রতীক্ষা!

এই উপবন শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই বনের আহ্বান মনে মনে তাঁকে চঞ্চল করে তোলে। প্রতিদিন এখানে এসে খানিকক্ষণের জন্য ধ্যানে বসে, কোন অতীত যুগের ভিতর চলে যায় গৌরাঙ্গ। কেয়াকাঁটার খোঁচা সহ্য করে যে দু'চার জন ভক্ত আসেন তাঁর সঙ্গে, তাঁরা একটা অদ্ভুত পরিবেশ অনুভব করেন। ধ্যানমগ্ন গৌরাঙ্গের চেহারায় তখন যেমন একটা অভূতপূর্ব জ্যোতি ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট উচ্চারণে কিছু বোঝা যায়, কিছু বা যায় না। তাঁরা আকুল দৃষ্টি মেলে চারদিকে খোঁজেন—কই কোথায় দাদা বলরাম, কোথায় শ্রীদাম সখা, সুদাম—তাঁদের দেহে মনে একটা শিহরণ জাগতে থাকে। এই কি তাঁর নব বৃন্দাবন!

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়, সহসা সে ধ্যান ভেঙ্গে যায়, প্রকৃতিস্থ হয়ে দাঁড়ান শ্রীগৌরাঙ্গ। একটা আকুল আহ্বান শুনতে পান শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রভু এসেছ? পায়ে লুটিয়ে পড়া ভক্ত শুক্লাম্বরের দেহ দুহাতে বেষ্টন করে তুলে ধরলেন গৌরাঙ্গ—তোমার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারি শুক্লাম্বর? এই ত এসেছি, চল, আজ তোমার কুটিরে কীর্তন হবে।

কদম গাছ ও লতাকুঞ্জে ঘেরা সাধনার উপযুক্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ। শুক্লাম্বরের চক্ষে গৌরাঙ্গের কি রূপ ধরা পড়েছে—কে জানে! সারাটা দিন তার কেটে যায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থেকে, তারপর সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে, প্রভু আসবেন তার ঘরে।

শুক্লাম্বরের ঘরে বসে, ভক্তদের সঙ্গে কত শাস্ত্রালোচনা, কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, আর ধীরে ধীরে সমাধান। গৌরাঙ্গ বলেন, সকল সংস্কারের উর্ধ্বে ওঠ, সকল বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে এক উদার সমাজের ভিতর স্বর্গলোক সৃষ্টি কর, তা হলেই মনের সম্মুখে খুলে যাবে সত্যশিবের পবিত্র জ্যোতির্লোক।

কদম বন আর লতাকুঞ্জ ঘিরে নেমে এসেছে অন্ধকার। রাত্রি হয়েছে—কোন্ আবহমান কাল ধরে বয়ে যাওয়া গঙ্গার উপরে রাত নামছে আকাশের নীলাঞ্জন ছায়া বুকে মেখে। সহস্র তারার দ্যুতিতে ঝলমল করতে করতে গঙ্গা নিরন্তর চলেছে সম্মুখের পানে, সে বয়ে নিয়ে যায় এক দেশের পরিচয় আর এক দেশে।

রাত্রি হয়েছে, অপেক্ষা করে বসে আছেন শচীমা, কখন ফিরে আসবে তাঁর নিমাই। অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ করে চক্ষুদুটি তাঁর নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে পথের পানে, কখন ফিরে আসবে তাঁর নিমাই —শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত কণ্ঠের আহ্বান আসবে—মা, ওমা! মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়, অবশেষে—অবশেষে সত্যিই ডাক এল—মা মাগো!

—আয়, এই তো আমি।

জপের মালা হাতে অপেক্ষারত মাতার সকল প্রতীক্ষার শেষ হল। ক্লান্ত পুত্র মায়ের কোলের পাশে শিশুটির মতই শুয়ে পড়ল। এই-খানেই তাঁর বিশ্রাম, সকল চিন্তা-ভাবনা দূরে সরিয়ে দিয়ে মায়ের কোলের পাশেই তাঁর সান্ত্বনার আশ্বাস। পুত্রের সর্বাঙ্গে বক্ষের সকল স্নেহ উজাড় করে দিয়ে কোমল কণ্ঠে মা কহেন—আজ কোথায় গিয়েছিলে নিমাই?

—শুক্লাম্বরের ঘরে কীর্তন করে এলাম মা।

—নিমাই, তুমি যেখানে-সেখানে যাও, যার-তার ঘরে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধর সকলকে। জাতির বিচার কর না, অনেকেই নিন্দে করে যে।

—মাগো, অনেকেই করে, তুমি তো কর না?

মায়ের দুই চোখে জল এসে গেল।

—নিমাই, কি বলব বাবা তোকে, শুনতে পেলাম ভিক্ষুক শুক্লাম্বরের ঘরে অন্নগ্রহণ করেছ!

—সত্যিই করেছি মা. হউক ভিক্ষুক, নীচু জাত, কিন্তু সে মানুষ। মনুষ্যত্বের কোন জাতি নেই মা, সারা শ্রীধাম নবদ্বীপে আমি মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। কত কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরেও আমি খাঁটি মানুষ পেলাম না মা। সব স্বার্থপর, হিংসুক, লোভী, অত্যাচারী। শুক্লাম্বরের মত হরিদাসকেও আমি বুকে জড়িয়ে ধরেছি, তারাই তো আমার জাত-ভাই, একই ঈশ্বরের সন্তান আমরা। খোলবেচা শ্রীধরকে লোকে ঘেন্না করে। তাকেও আমি আমার দলে টেনে নিয়েছি। লোকের কথা শুনে তুমি দুঃখ করো না মা। তোমার কোলে জন্মেছি বলেই তো এত শক্তি আমার হয়েছে। তুমি আশীর্বাদ করো মা, এই বুকটা যেন আরও বড় হতে থাকে। চারপাশের গরীব দুঃখী অত্যাচার পেয়ে পেয়ে যারা শুকিয়ে যাচ্ছে, তাদের আমি যেন আশ্রয় দিতে পারি আমার বুকে। মাগো, তুমি কি দেখোনি আমার ভক্তদের সঙ্গে যখন কীর্তন করতে করতে পথে চলতে থাকি, তখন কি দশা হয়! তখন এই কীর্তন করতে করতেই ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, গরিবকে বুকে জড়িয়ে আপনার করে নিচ্ছে। মাগো তুমি তো জানো, আচার্যদেবরা আমায় প্রতিদিন বলেন, আমার উপর নির্ভর করে আছে জাতি। ওঁরা বলেন, সমাজপতিদের শাসন, ধনীর শাসন, আর রাজ কর্মচারীদের শাসনের ফলে আমাদের নীচুতলার মানুষগুলির জীবন একেবারে নির্জীব শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

মাগো, এই মানুষগুলোকে তুলতে হবে। তারা যে শক্তিহীন নয়. এই কথাটি তাদের বোঝাতে হবে। যত সব অনাচার আর কদাচারে ওদের মন আর জীবনের ধারা পশুর মত হয়ে গেছে। মা, ওদের তুলতে গেলে ওদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে হবে, ওরা যে কারুর চেয়ে ছোট নয়, সেটাই বোঝাতে হবে। এই ভেদাভেদ দূর করতে হলে, ওদের সঙ্গে না মিশলে তো হবে না। অত্যাচার শুধু সহ্য করে যাওয়া নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কি করে সংগ্রামশীল হয়ে উঠবে তাও শেখাতে হবে। তাই তো ওদের সঙ্গে এত মিশি মা, ওদের সঙ্গে খাই, ওদের ঘরে বসি। মাগো, জগাই মাধাইয়ের কথা তো শুনেছ। একেবারে পশু হয়ে গিয়েছিল ওরা. আমরা ভালবাসা দিয়ে ওদের গুণ ফুটিয়ে তুলেছি। সংসারে কে বড় আর কে ছোট মা?

চোখের জল মুছে চুপ করে থাকেন মা। জাতির, দেশের, ত্রাণকর্তা এই ছেলেকে কী বলবেন তিনি! তাঁর আনন্দ এবং ভয় কোনটা যে বেশি, তা বুঝবার ক্ষমতা থাকে না তাঁর।

এদিকে একান্ত, একমনে পুজোর আয়োজন করছে বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুর মন্দিরে। মায়ের কোলের ভিতর সকল ক্লান্তি দূর করে দিয়ে নিমাই ধীরে ধীরে এসে বসলেন পুজোয়।

অধিক রাত্রিতে স্বামী ও মাতার আহারাদির পর স্বামীর পাতের প্রসাদ গ্রহণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করে। নিজহস্তে সযত্নে রচিত সুগন্ধি তাম্বুল স্বামীর হাতে তুলে দেয়। হেসে পাশে টেনে নেয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই।

—কত ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছ ঘর। এত ফুল কে দিল প্রিয়া! (বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কখনো প্রিয়া, কখনো প্রিয়াজী বলে সম্বোধন করে।) তোমায় সখি চন্দন বাটিতে ভর্তি করে চন্দন গুলে রেখে গেছে, আমার মনের কথাটি কি করে টের পেল, বল তো? আজ বড্ডো ইচ্ছা করছে তোমায় সাজাই মনের মতো করে, এসো কাছে।

সস্নেহে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেয় নিমাই, ফুল-চন্দনের সাজে অপূর্ব রূপ ফুটে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার। তার দিকে তাকিয়ে থাকে নিমাই, তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা বেদনায় ভ'রে ওঠে নিমাইয়ের মন, কাছে টেনে বলে—আমি তোমায় সাজালাম, তুমি আমায় সাজাবে না প্রিয়াজী? বিষ্ণুপ্রিয়া সলজ্জে কোমল দুটি হাতে সাজিয়ে দেয় স্বামীকে। সারাদিনের পর এই মুহূর্তটাই শুধু ওরা পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবায় ক্রমে ঘুমিয়ে পড়েন নিমাই। স্বামীর ক্লান্ত মুখের পানে তাকিয়ে মমতায় মন ভরে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার। একান্ত মনে প্রার্থনা জানায়, তুমি এত লোককে শক্তি দাও, আমাকেও সেই শক্তি দাও, আমি যেন তোমার সকল কাজের ভাগ, সকল কষ্টের ভাগ, ভাগ করে নিতে পারি।

তিন

কিন্তু এই কীর্তন যারা সহ্য করতে পারে না, সেই সনাতন ধর্মীরা ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল এবং তাদেরই চক্রান্তে একদিন বাদশাহের দৌহিত্র নবদ্বীপের জেলা শাসক চাঁদকাজী সাহেব হরি সংকীর্তন বন্ধ করে দিলেন। চাঁদকাজীর সে আদেশ শ্রবণ করলেন গৌরাঙ্গ, এবং অত্যন্ত শান্ত মনে তাঁর পরমভক্ত নিত্যানন্দকে ডেকে আদেশ দিলেন—সারা নবদ্বীপে ঢোল পিটিয়ে দাও, কাজীর এই অন্যায় আদেশ আমি অমান্য করব।

পরদিন সমস্ত নবদ্বীপবাসীর হরিনাম গানে মুখরিত হয়ে উঠল নবদ্বীপ শহর। কাজীর প্রাসাদ পরিবেষ্টিত হয়ে উঠল কীর্তনীয়ার দলে, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাজীর সৈন্য-সামন্ত। সভয়ে কাজী স্থির হয়ে রইলেন তাঁর আসনে। গৌরহরি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন এই অন্যায় আদেশ করেছ, যা আমি মানতে পারি না?

কাজী নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন তাঁর অপরাধ, কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, তোমার সঙ্গে আমিও কীর্তন করতে পথে বেরুব, আমায় সেই অনুমতি দাও—

নামকীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ জয় করে নিলেন বিধর্মী শাসকের মন। পাঁচশত বৎসর পূর্বে এতেই বোধহয় প্রথম সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হল পৃথিবীতে।

রাজনীতি দিয়ে নয়, আন্দোলন করে নয়, অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাতে নয়,

শুধু সত্যাগ্রহ করে পৃথিবীর প্রথম গণবিপ্লবী জয় করে নিলেন মানুষের মন। জয় করে নিলেন মদ্যপ মাতাল অসচ্চরিত্র জগাই মাধাইকে তাঁর প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে।

এত বড় মানবপ্রেমিক পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি, যাঁর প্রেমের তরঙ্গে সমস্ত পাপ তাপ ভুলে নবদ্বীপ একদিন ভেসে গিয়েছিল।

এখানে একটু গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বের কথা বলা দরকার।

শ্রীপদ মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন বাঙ্গালী। পরাধীন বাংলার হীনবীর্য তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিত। এই দুর্বলতা দূর করে দিয়ে, স্বাধীন মনোভাবে সকলকে দীক্ষিত করবার চেষ্টায় তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রভাবান্বিত করে তুলেছিলেন। আচার্য অদ্বৈত তাঁর একজন মন্ত্রশিষ্য। অদ্বৈতাচার্য বুঝেছিলেন যে, যে ধ্বংসের পথে দেশ চলেছে, তাকে উদ্ধার করতে একজন বিরাট মহামানবের আবির্ভাব প্রয়োজন। তাঁর সেই সাধনা ব্যর্থ হয়নি। তার পরেই দেশে যার আবির্ভাব ঘটল, তিনিই বাংলার প্রেমের ঠাকুর এই গৌরাঙ্গ, নদীয়ার নিমাই, জাতির পরিত্রাতা মহাপ্রভু।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই মহাপুরুষ তাঁর দিব্য জীবনের আদর্শ ছাড়া তাঁর পূর্ণ পরিচয় আর কিছুই রেখে যাননি। তাই তাঁর জীবনীকারেরা বলে গিয়েছেন—

—'বিদ্যার গৌরব নাই চৈতন্যের হাটে।'

ভাবতে বিস্ময় লাগে, এতবড় দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিত, যুগাবতার রূপে যিনি সমস্ত ভারতবর্ষে পূজিত হলেন ভবিষ্যতে, তিনি কোন শাস্ত্রকথার শ্লোক রেখে গেলেন না তাঁর অনুবর্তীদের জন্য। কিশোর বয়সে একদিন ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী রচনা করে নিমাই গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বিস্মিত ও পুলকিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য সেগুলোর আর কোন অস্তিত্বই রইল না। একদিন সহপাঠী রঘুনাথের সঙ্গে শাস্ত্রকথা নিয়ে

আলোচনাকালে সহসা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিমাই সেই অমূল্য জিনিসগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গায়।

যে জিনিস দারুণ অবহেলার সঙ্গে ত্যাগ করলেন নিমাই, তাকে পরম আদরে বক্ষে ধারণ করলেন গঙ্গা। রঘুনাথকে বললেন নিমাই—ভাই, শাস্ত্রকথা লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। যে প্রতিষ্ঠা চাও তুমি, তুমি তাই কর। তোমার প্রতিষ্ঠার পথে আমি দাঁড়াব না।

একদিন মুরারী গুপ্তের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তুমুল তর্কযুদ্ধের সময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ভাই, এ সব পণ্ডিতদের মধ্যে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার মত কিছু নেই। শুকনো পাণ্ডিত্যের মধ্যে পাণ্ডিত্যই শুধু আছে, প্রেম নেই। এ শাস্ত্রজ্ঞানে কি হবে আমার! জান তো, কৃষ্ণ বশ হয় কৃষ্ণপ্রেম রসে।

তাই, যশ ও গৌরবের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারল না। প্রেমের আবেগে, দু'বাহু তুলে, পথে পথে বুকে তুলে নেন অনাথ কাঙ্গালকে, দুরন্ত পাষণ্ডকে। বিরোধী শাসক দল ও সমাজপতিদের সকল রোষ তুচ্ছ করে শুধু প্রেম, ধর্ম ও হরিনাম সম্বল করে বাংলা-দেশকে প্রেমে প্লাবিত করেন। সুদূর নীলাচল পর্যন্ত সমস্ত দেশবাসীর মন আলোড়িত করে তুললেন তিনি। দুর্জয় প্রাণশক্তি ও দুর্দমনীয় প্রভাব দিয়ে তিনি আঘাত হেনেছিলেন, সমাজ ও রাজশক্তির সকল রকম অন্যায়ের উপর।

বৈষ্ণব ধর্ম যে দুর্বল ও অক্ষমের আর্তনাদ নয়, সেদিনের রাজ-পুরুষরা ও সমাজপতিরা অনুভব করেছিলেন। বাংলাদেশকে প্রেম-রসে প্লাবিত ক'রে দিয়ে চললেন সারা ভারতের পথে পথে, পাণ্ডিত্যাভিমানীদের অহংকার চূর্ণ করে নামামৃত প্রবাহে ভাসিয়ে চলতে লাগলেন। এ চলার বিরাম নেই, উর্ধ্ববাহু, উর্ধ্বমুখ, শূন্য দৃষ্টি, আত্মহারা দিশাহারা মুখে কেবল হরি, হরি, হরি, হরি।

এমনি করে ছয় বৎসর কাটালেন গোরাচাঁদ পথে পথে। তারপর ১৪ বৎসর কাটালেন পুরীধামে রাজপণ্ডিত কাশীনাথ মিশ্রের বিরাট প্রাসাদের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি কক্ষে। ঐ ক্ষুদ্র কক্ষটি আজও শ্রীচৈতন্যের পূতঃ পদধূলি বক্ষে মেখে গম্ভীরা নামে দেশ-বিদেশের লোকেদের কাছে খ্যাত হয়ে আছে।

এই গম্ভীরাতে বসেই তিনি মুখে মুখে আটটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন তাঁর পরম ভক্ত স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। তাঁরা ঐ শ্লোকের নাম দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টক।

চার

"সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন
ছিঁড়িতে হবে ;"

জগন্নাথ মিশ্রের ভাঙ্গা ঘর আলো করে, একদিন ফুটে উঠেছিল নদীয়ার চাঁদ। ষোলকলায় সমৃদ্ধ হয়ে, সে চাঁদ একদিন ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে। মায়ের বুকের নিধি, মায়ের ক্ষুদ্র বক্ষে আর ধরল না। বিশ্বের ঘরে ঘরে অনাথ, আতুর, দুঃখী কাঙ্গালকে প্রেম বিলোতে বিলোতে সে ছুটে চলল দেশ-দেশান্তরে। অন্ধকার দূর করে সারা বিশ্বে আলো বিকিরণ করতে লাগল নদীয়ার চাঁদ।

মায়ের সঙ্গে, পত্নীর সঙ্গে নিমাই সুকৌশলে তাঁর যথাযথ কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করলেন। সংসারে কোন দ্রব্যের অভাব নেই, কোন বিশৃঙ্খলা নেই। সংসার-ধর্মে পুত্রের অনুরাগ দেখে, মায়ের আনন্দ আর ধরে না। বধূর তৃপ্ত মুখ দেখে মায়ের মন মহা পুলকিত।

"মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
সে কথায় থাকয়ে অন্তরে সুস্থ হৈয়া॥
পরিজনে পরিতোষে, যার যা উচিত।
এই মনে সবাকারে করয়ে পিরীত॥
সব লোক জানিবেক নহিব সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজদাস॥"

দুটি মন নিয়ে নিমাই সংসারে চলে বেড়াচ্ছে। একটি মন নিরন্তন মায়ের পাশে, বধূর পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে পরিহাসপ্রিয় স্নেহময় কোমল। অন্য মনটিতে অনুক্ষণ একই কথা জেগে রয়েছে ঃ

"এই সংক্রমণ, উত্তরায়ণ দিবসে
নিশায় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।"

বুকের ভিতর একটা বেদনার তার বেজেই চলেছে ঃ

"সময় হয়েছে নিকট
এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

এমনই সময়ে একদিন সখীদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাট থেকে দ্রুত ফিরে এসে, শচীদেবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মাগো, অমঙ্গলের কি-সব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমার নাকের স্বর্ণকেশর কোথায় যে হারিয়ে গেল. খুঁজে পেলাম না।

শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শচীদেবী ঃ কোথায় হারালে, কি করে হারালে? খুঁজে দেখেছ ত ভাল করে?

অমিতা ও কাঞ্চন এগিয়ে এসে বললে—অনেক খুঁজেছি মা, কোথায় যে পড়ল! তা ছাড়া পথে আর থাকা গেলও না মা, প্রিয়ার ডান চোখ বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, কাঁদতে লাগল প্রিয়া। ওকে নিয়ে চলে এলাম তাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ

"দক্ষিণে ভুজঙ্গ সেও রহি রহি দেখি।"

(পদাবলী বাসুদেব)

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতেই বসে পড়লেন মা। হায়রে, যে ভয় আমার বুকে দিন রাত জেগে রয়েছে তাই বুঝি হয়।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ সব কথাই শুনছিলেন। হেসে, কাছে

এসে বললেন—মা, তোমার বউ কি দিন দিনই ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছে? এসব ঘটনা, এ তো প্রতিদিনই সব মানুষের জীবনেই ঘটছে। তার জন্য তুমিই বা এমন ব্যাকুল হয়ে পড়ছ কেন মা? শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর, দেখবে সব অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে। আজ রাত্রিতে ঠাকুরের ভাল করে পুজো দাও মা, পায়সান্নের ভোগ দাও।

খানিকটা আস্বস্ত হয়ে মা চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালেন। তাহলে কিছু নয়, যে ভাবনা তাঁর মনে গেঁথে রয়েছে, সেটা তাহলে মিথ্যে। তাই হোক, তাই হোক। হে দেবতা বিষ্ণু, মায়ের মন তুমি জান, তুমিই সব দিক রক্ষা কর প্রভু। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মা বধূর পানে তাকিয়ে বললেন—ওঠ তো বৌমা, রান্নার যোগাড় করে দেবে চল।

সকল দুঃখ সকল ভাবনা ভুলে গিয়ে মাতা ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন—আজ পুজোর প'র সবাইকে পায়সান্নের প্রসাদ খেয়ে যেতে বল।

খিড়কী দুয়ার খুলে কে একজন ভেতরে এল, হাতে তার একটা লাউ।

—জয় হোক মা জননী, জয় হোক প্রভু, মা গো, আমার গাছের প্রথম লাউটি প্রভুর জন্য নিয়ে এলাম।

—এস শ্রীধর, ভাল আছ ত? সুন্দর লাউটি তো তোমার! শ্রীধর, আজ রাত্তিরে কীর্তনের পর প্রসাদ নিয়ে যেও।

মাতা তুলে নিলেন লাউটি।

শ্রীধর সকলকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

আর একজন ভক্ত এসে প্রবেশ করল এক ভাঁড় দুধ হাতে নিয়ে।

হেসে গৌরাঙ্গ বললেন—মা, ঠাকুরের আজ কি খাবার ইচ্ছা, ঠাকুরই তা জানিয়ে দিলেন। লাউ পাঠালেন, দুধও পাঠালেন, লাউ দিয়েই আজ পায়েস রাঁধ মা।

"এক হাতে লাউ ধরি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইল গোচর॥
হেনই সময়ে আর কোন পুণ্যবান।
তুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় হইল ভাল।
তুগ্ধ লাউ পাক দিয়া করহ সকলে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল, নিমাইয়ের প্রসন্ন মুখ দেখে পুলকিত হয়ে উঠলেন তু'জনেই। কেশর হারানোর কথা, সকল অমঙ্গলের কথা ভুলে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, অমিতা, কাঞ্চন, আয় ভাই, কাজগুলো সেরে নিই তাড়াতাড়ি করে। আজ সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে নাম-গান শুনব সকলে মিলে।

রান্নাঘরে পরম উৎসাহে ভোগের রান্না চলল—আর ঠাকুরঘরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে নিমাই ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। চোখের জলে ভেসে নিমাই সেদিন তাঁর দেবতার পায়ে যে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, তাঁর নীরব দেবতা নির্বাক মৌন বিস্ময়ে শুধুই কি তা শুনে যেতে লাগলেন? মানুষের বুক কি পাষাণ? নিরুপায়, নিমাই নিরুপায়। ক্ষুদ্র সংসার থেকে বৃহৎ সংসারের কাজে তাঁকে যে জীবন দান করে দিতে হচ্ছে! বুক যতই ভাঙ্গুক, চোখে যতই জল আসুক, এই মায়া তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে। নিমাইয়ের মন বলতে লাগল,—প্রভু, আর কয় দণ্ড, ক'টা প্রহর মাত্র বাকী, এই সংসার ত্যাগ করে যাবার। মনের কোণে যদি তুর্বলতা জাগে, তবে ক্ষমা কর প্রভু! কিন্তু এদিকের কর্তব্য, সেও ত তোমারি নির্দেশ প্রভু! আজ বিদায়ের দিনে এই প্রার্থনা জানাই, আমারই উপর একান্তভাবে যারা নির্ভর করে আছে, তাদের আর কেউ নেই, তাদের তুমি সান্ত্বনা দিও।

বহুক্ষণ কেটে গেল ঠাকুরঘরে, তারপর বেরিয়ে মায়ের সঙ্গে তু'

চারটি কথা, বধূর হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখখানির পানে একটু তাকিয়ে, রান্নার ব্যাপারে অযথা একটু তাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভক্তদের ঘরে ঘরে বেড়িয়ে এলেন একবার। তাঁর প্রফুল্ল মুখে বিষাদের ছায়া নেই, ভক্তরাও পুলকিত হলেন, নিশ্চিন্ত হলেন। একান্তে ডেকে একবার বৃন্দাবন দাসের জননী মায়ারাণী দেবীকে বললেন—মাগো, আজ আমার ঘরে কিছু ফুল পাঠিয়ে দিও। নারায়ণী দেবী সযত্নে সত্বর তাঁর বাগান উজাড় করে ফুলের ব্যবস্থা করলেন।

আজ শেষ রাত্রি, চিরজীবনের জন্য আজ শেষ রাত্রি! লক্ষ্মীপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনার শুরু হবে আজ রাত্রি থেকেই। এই বিরহের কোন সান্ত্বনা নেই। এই বিচ্ছেদের একটা ব্যথা গৌরাঙ্গকেও কি স্পর্শ করেনি? গৌরাঙ্গ যতই সেটা ভুলে থাকতে চান ভুলতে পারেন কই!

"বৈরাগ্য সময়ে প্রেম উজারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উন্মত্ত চিত॥
এ হেন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু।
অনুরাগী প্রেমের ভিখারী দীনবন্ধু॥
এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
এত জানি মনে কোন না করে প্রমাদ॥"

রাত্রি হল। বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রার্থিব রাত্রি অবশেষে এসেই পড়ল।

কিন্তু কার আকাঙ্ক্ষা? কোন্ আকাঙ্ক্ষা?

সে রাত্রির নাম-গানের পরে নিস্তব্ধ কক্ষে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন ভক্তরা। শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে যেন যোগ দিয়েছেন সকলের সঙ্গে। ঊর্ধ্বপানে দুটি আচ্ছন্ন আঁখি তুলে যুক্তকরে বসে রয়েছেন

শ্রীগৌরাঙ্গ। বক্ষ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। নির্বাক, নিস্পন্দ। কিন্তু কি অপূর্ব জ্যোতি স্ফুরিত হচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে!

রাত্রি গভীর হচ্ছে। গঙ্গা স্নানের পর প্রসাদ গ্রহণ করে ভক্তরা গৃহে ফিরেছেন সকলে। গৌরাঙ্গদেব আর একবার শেষবারের মত প্রবেশ করলেন তাঁর উপাস্য দেবতার মন্দিরে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মন সেদিন বড় পুলকিত। ফুলে ফুলে বাগানের মত হয়ে গেছে ঘর। স্বামীর মনোভাবও আজ অত্যন্ত কোমল। বিষ্ণুপ্রিয়া ত্বরিত হস্তে গৃহকর্ম সমাপন করতে লাগল।

পুজো শেষ করে নিমাই মায়ের কোলের কাছে এসে শুয়ে পড়ল। —দেহ মন বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মা তাঁর কল্যাণ হাত দুখানি পুত্রের মাথায় রেখে নীরব বসে রইলেন।

—মা গো, মা।

—কি বাবা নিমাই?

—কিছু না মা, খালি খালি তোমাকে আমার ডাকতে ইচ্ছে করে, মা-মা-মা-মা ডাকতে ডাকতেই যদি ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম!

মায়ের দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কত কষ্টের ধন তাঁর নিমাই, তাঁর চোখের মণি, বুকের ধন।

—নিমাই।

—কি মা?

—সারাদিন কত পরিশ্রম করেছ, এখন ঘুমোবে না?

—আর একটু তোমার কাছে থাকি। আজ আমার কি ইচ্ছে করছে জান মা? ছেলেবেলায় যেমন ভয় পেলে, ব্যথা পেলে, ছুটে আসতাম তোমার কাছে, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে সব কষ্ট ভুলে যেতাম, সেই রকম থাকতে ইচ্ছে করছে।

মায়ের দু'চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এল। মনে মনে ভাবছেন নিমাই, আজ এরকম করছে কেন! কিসের ব্যথা ওর আজ এত?

—বিছানায় গিয়ে শোও নিমাই।

—যাচ্ছি মা, মাগো একটু পায়ের ধূলো দাও।

—আজ এরকম করছ কেন বাবা ?

—কিছু না মা, এমনি। তোমাকে কি ছাড়তে ইচ্ছে করে মা !

—বিষ্ণু মঙ্গল করুন তোমার।

রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হয়ে যাচ্ছে, শচীদেবী পুত্রকে ডেকে তাঁর শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের মলিন মুখে কিসের যেন একটা বেদনার ছায়া। সেই অজানা বেদনার কঠিন শেল মায়ের বুকে একটা ক্ষত সৃষ্টি করতে লাগল।

সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় অপূর্ব সুন্দর বেশ। স্বামীর মনের মত করে, নানা রত্নালঙ্কারে সখীরা তাকে সাজিয়ে দিয়েছে। হেসে বলেছে, —আজ তোর ফুলশয্যা সই, গৌরাঙ্গঠাকুর কত ফুল যোগাড় করেছে দেখেছিস ?

তাম্বুলের বাটা হাতে নিয়ে, ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকিয়ে দেখল, হাসিমুখে পালঙ্কের উপর বসে আছেন গৌরাঙ্গ। নারায়ণী দেবীর দেওয়া দিব্যবস্ত্রে কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে গৌরাঙ্গকে। এসে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরে, তাঁকে নিজ পার্শ্বে বসিয়ে আদর করে বললেন—তুমি কি সুন্দর প্রিয়াজী।

"শয়ন মন্দিরে সুখে প্রবেশ করিলা।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া দিলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে।
পরম পীরিতি করি বসাইলা কোলে॥"

আবার হেসে বললেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, বড় সুন্দর তুমি। নারায়ণী দেবী তোমায় কত ভালোবাসেন, কত ফুল পাঠিয়েছেন তোমার জন্য, এই ফুলের ভিতর বসে আজ সারারাত আমরা গল্প করব, কেমন ? আজ মনে হচ্ছে, আজ যেন আমাদের রাস পূর্ণিমার রাত্রি। আজ সারারাত

গল্প আর আনন্দ। তোমার মনের যা ইচ্ছে, আজ তুমি সব বল আমায়, আজ আর কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভ রেখো না মনে।

প্রিয়াজীর লাজ-বিনম্র মুখখানি মধুর হাসিতে ভরে গেল। হেসেই বলল—তুমি তো কতদিন আমায় সাজিয়েছ, আজ তোমায় আমি সাজাব। গৌরাঙ্গ সহাস্যে সম্মতি দিলেন, হেসে বললেন—আজিকার এই রাসপূর্ণিমার রাত্রি চির জীবনের জন্য অম্লান হয়ে থাকুক। কাছে থাকি বা না থাকি আজকের কথা মনে রেখো সারাজীবন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনের আনন্দে আজ স্বামীকে সাজাতে লাগলেন—সুরভিত সুন্দর মালতীর মালা দিলেন গলায়। যূঁই ফুলের মালা পরালেন দু'টি বাহুতে। চাঁপা ফুলের মালা দিয়ে হাত দু'খানিতে করে দিলেন বালা। দু'টি কানে দিলেন কদমের ফুল। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশিতে জড়িয়ে দিলেন মতি বেলের মালা। চরণ দু'টিতে নূপুর করে দিলেন অশোক ফুলের কলি দিয়ে। তারপর সর্বাঙ্গে লেপন করে দিলেন, সুগন্ধি চন্দন, গৌরাঙ্গের প্রশস্ত ললাটে এঁকে দিলেন কুমকুম কস্তুরি মিশ্রিত চন্দন তিলক আর রক্তিম কপালে দিলেন অলকাবলী রঞ্জিত করে। তারপর স্বহস্ত রচিত সুগন্ধিযুক্ত তাম্বুল মুখে তুলে দিলেন স্বামীর।

তারপর নিজের শাড়ি দিয়ে স্বামীর পা দু'খানি মুছিয়ে দিয়ে একখানি দর্পণ এনে স্বামীর সম্মুখে ধরে, খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

তুমি কি অপূর্ব সুন্দর গো, ঠিক যেন কৃষ্ণ ঠাকুর!

"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগরু কস্তুরি গন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥"

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—আমি কৃষ্ণ ঠাকুর হলে তুমি কে বল তো ?

সলজ্জ রক্তিম মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—ও কথা বোলো না গো, তিনি ছিলেন মহাদেবী, আমি কি তাঁর মত হতে পারি ?

—পার, আমি বলছি পার, নিজের বুকের ভিতর দৃষ্টি দিয়ে ছ্যাখ তো, আমি যদি কৃষ্ণ হতে পারি, তুমি কেন রাধা হবে না ? আমার সঙ্গে এই যোগ কি তোমার শুধু এই যুগের ? তা নয়, তা নয়, আমাদের সম্পর্ক যুগ যুগান্তের। আমার কি মনে হয় জান ? একদিন সত্যযুগে আমি এসেছিলাম রামচন্দ্ররূপে। তুমি সেদিন আমার পাশে ছিলে সীতা। যেদিন ছিলাম দ্বারকার রাজা, তুমি ছিলে আমার রুক্মিণী, নন্দের ঘরে যেদিন জন্মেছিলাম নন্দ-নন্দন হয়ে, সেদিন তুমি ছিলে আমার রাধা-- যুগে যুগে বহুবার আমরা এসেছি জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য। আমি বিশ্ববিধাতার শ্রীবিষ্ণুর দূত, আর তুমি আমার শক্তি। ধর্মের জন্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আরো বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের।

স্বামীর চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক রূপ দেখে ভীত হয়ে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া—ওগো, এরকম করছ কেন ? কি হয়েছে তোমার ? তাকাও, তাকাও আমার দিকে।

সহসা আপন জগতে ফিরে এলেন যেন গৌরাঙ্গদেব। হেসে বললেন—ভয় পেয়েছ নাকি ? ভয়ের কি আছে, যা ঘটবার তা ঘটে যাবে, শক্তির সঞ্চারও আপনি হবে, আমাদের কেবল ন্যায়পথে ধর্মের পথে চলতে হবে। বিষ্ণুপ্রিয়া, যদি কাছে কোন দিন নাও থাকি, এই কথাগুলোই মনে করে রেখো। ওকি, ওরকম ক'রে তাকাচ্ছ কেন ? চোখে জলও এসে গেছে, কী ছেলে মানুষ তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া। এসো, কাছে এসো, আমায় তুমি সাজালে, এখন আমি তোমায় সাজাবো। আজ আমাদের রাসলীলা, আজ কি চোখে জল

ফেলতে আছে? গভীর প্রেমভরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে টেনে নিলেন গৌরাঙ্গ।

দূরে জঙ্গলে শেয়াল ডেকে উঠল, চমকিত হয়ে উঠলেন গৌরাঙ্গ। রাত্রির প্রহর কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? আর কতটুকু, আর কতটুকু সময় বাকী! এসো এসো আরও কাছে এসো, কী সুন্দর চুলের গোছা তোমার। এলোচুলের খোঁপা বেঁধে দিয়েছে বুঝি তোমার সখীরা? এসো আমি তোমার খোঁপায় এই মালতীর মালাখানি জড়িয়ে দিই। তোমার কালো চুলে মালাগাছি, কি সুন্দর মানিয়েছে ছাখ তো!

তারপর গৌরাঙ্গ প্রিয়াজীর সুন্দর ললাটে সুগন্ধী চন্দনের অলকা তিলকা রচনা করে দিয়ে মাঝখানে শুভ সিন্দুরের উজ্জ্বল একটি টিপ এঁকে দিলেন। কমল নয়ন দু'টিতে কাজলের রেখা এঁকে দিয়ে সর্বাঙ্গে লেপন করে দিলেন অগরু কুমকুম ও চন্দন। একে একে সবই পরানো হল, মাথায় মুকুট, গলায়, বাহুতে ও কটিতটে হার পরিয়ে পত্নীর এই ভুবন-মোহিনী মূর্তির পানে তাকিয়ে গৌরাঙ্গের চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। মন যে কি চায় হায়রে মনের নিভৃত মণিকোঠাতেই তা গুপ্ত হয়ে থাক।

"দীর্ঘ কেশদামের চামর-জিনি আভা।
করবী বাঁধিয়া দিল মালতীর শোভা॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
ত্রৈলক্য মোহিনী রূপ নিরীখে বদন।
অধর মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।..."

(চৈতন্য ভাগবত)

বৃন্দাবনে একদিন লীলা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ, নবদ্বীপে আজিকার এই গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলা।—কিন্তু কতটুকু সময়ের জন্য! সাধ মিটল না, আশা পূর্ণ হল না—হায়রে—

"সময় হয়েছে নিকট
এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

রাত্রির শেষ প্রহরের বার্তা বলে গেল শৃগাল। স্বামীর প্রেমালিঙ্গনের ভিতর ঘুমিয়ে পড়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। ক্ষণকালের তন্দ্রার ভিতর থেকে জেগে উঠলেন গৌরাঙ্গসুন্দর। জানালার ভিতর দিয়ে একবার তাকালেন আকাশের পানে, আকাশ কি ফিকে হয়ে আসছে? রাত্রি শেষ হতে আর কি দেরি নেই? বাঁধন ছিঁড়ে যাবার লগ্ন এসে গেছে। ঘুমাও, কল্যাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমাও, যে দুঃখের বোঝা দু'জনে ভাগ করে নিচ্ছিলাম, সে দুঃখ কাল সকাল থেকে একাকিনী ভোগ করে যাও হতভাগিনী। এ জীবনে আর দেখা হবে না,—।

অত্যন্ত কোমল হস্তে প্রিয়াজীর মস্তকখানি নিজ অঙ্গ থেকে সরিয়ে বালিশের উপর রাখলেন। সেই পরম প্রিয় ঘুমন্ত পবিত্র মুখখানির অপূর্ব সৌন্দর্যরাশির প্রতি বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেই অপরিস্ফুট হাস্যরেখা, সেই অবশ অঙ্গভঙ্গিমা, সর্বোপরি প্রিয়তমের প্রতি সর্বতোভাবে নিবেদিত এই তনুমন—গৌরাঙ্গদেবের চক্ষু আর ঘোরে না প্রিয়তমার মুখের উপর থেকে।

কিন্তু তবুও রাত্রি শেষ হয়ে এল যে! হায়রে, সত্যিই রাত্রি শেষ হল।

কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল নয়ন থেকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহের উপর যেন শেষ আশীর্বাদ! একবার একটু নত হয়ে, অতি সন্তর্পণে

শেষ চুম্বনটুকু প্রিয়ার মুখের উপর এঁকে দিয়ে, ধীরে ধীরে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। আর ফিরে তাকালেন না!

ইহজীবনের লীলা যে শেষ হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার। বিষ্ণুপ্রিয়া জানতেও পারল না।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করলেন, তারপর গৃহদেবতা, জন্মভূমি এবং মাতা, মা শচীমাকে উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে পশ্চাৎ ফিরলেন!

গৌরাঙ্গদেবের এই সময়ের মনের অবস্থা গ্রাম্য কবিরা গেয়ে বেড়ান—

কাল ঘুমে ঘুমোলে মাগো,
জেনেও জানো না—
এই জনমের মত বিদায়
মাগো আর তো হবে না।

গৃহের বারান্দা থেকে নেমে দাঁড়ালেন, তারপর রওনা হলেন। রওনা হলেন গৌরাঙ্গসুন্দর, মৃদু করতালি দিতে দিতে বেরিয়ে পড়লেন একেবারে। চক্ষের জলে দৃষ্টি যে ঝাপসা হয়ে আসছে, দৃঢ়শক্তিবলে তা' রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বক্ষ বিদীর্ণ করে ধ্বনি উঠতে লাগল। মা, মা, মা, মাগো, তোমার কোল ছেড়ে বৃহৎ সংসারে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চলেছি, কিন্তু সমস্ত বুক জুড়ে যে তুমি সে কথা কি করে ভুলব!

মায়ের সেবা ছাড়ি আমি
করিয়াছি সন্ন্যাস
ধর্ম নহে, কৈনু আমি নিজ ধর্ম নাশ
মায়ের প্রেমাংশ আমি, মায়ের সেবা ধর্ম
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম।

শয্যার উপর সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত অস্থির ভাবে কেটেছে শচীমায়ের, শেষ রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখে শয্যায় উঠে বসলেন এবং ত্বরিত শয্যা থেকে নেমে·দ্বার খুলে, ছুটে বেরিয়ে এলেন আঙ্গিনায়।

"বউমা বউমা ঘুমায়োনা আর
উঠ অভাগিনী দ্যাখো একবার
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই
বুঝি পলাইল করি অন্ধকার…"
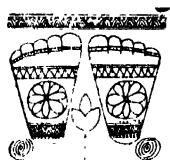
পাঁচ

বুকের ভিতর থেকে নিশি জাগরণের আবেশটুকু তখনও কেটে যায়নি, শেষ প্রহরের প্রিয়তমের সেই মৃদু স্পর্শটুকু সুখস্বপ্নের মত জড়িয়ে রয়েছে চোখের পাতায়। সহসা সেই চক্ষু খুলে গেল মায়ের আর্তনাদে।

কি হল, কি হল মাগো—ও মা তাই ত! রাত্রিবাসটুকু পড়ে আছে দ্বারপ্রান্তে, শুধু সেইটুকু স্মৃতি! আর কিছু নাই।

শয্যায় লুটিয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বৃথা এ সজ্জা, বৃথা এই ফুলহার, বৃথা সব আভরণ। এ লজ্জা ঢাকব কি দিয়ে! কাঁদতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়া। —মা গো মা, আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি যাকে রাখতে পারলে না, আমি তাকে কি করে রাখব!

বধূর হাত ধরে শচীমাতা বেরিয়ে এলেন পথে: কোথায়, কোথায় গো, কোন্ পথে গেল? মর্মভেদী আর্তনাদে চিৎকার করতে লাগলেন, নিমাই, নিমাই। অবগুণ্ঠিতা বধূ পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে শুধু ভাসতে লাগল চোখের জলে। এত জল—এত জল কোথায় ছিল কাল রাত্রিতে!

আর্তনাদ শুনে সমস্ত সুপ্ত নবদ্বীপ কেঁপে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল সব রাস্তায়। ছুটে এলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, ছুটে এলেন মুরারীমুকুন্দ এবং আরও অনেকে। সন্ধানের জন্য

সমস্ত নবদ্বীপবাসী ছুটে চলল দিকে দিকে। হায়রে কোথায় পাবে, কোথায় পাবে সেই পলাতকের সন্ধান!

পূর্ব ব্যবস্থামত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন ও শ্রীনিত্যানন্দ অপেক্ষা করছিলেন বহির্দ্বারে, এখন তিনজনে দ্রুতপদে গঙ্গাতীরের দিকে চললেন। মাঘের দারুণ শীত, বাতাস অত্যন্ত শীতল, শেষরাত্রির চাঁদের আলো অত্যন্ত ম্লান, অত্যন্ত করুণ বিষণ্ণ। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার বুকে। যে ঘাট থেকে ঝাঁপ দিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে গেলেন গৌরাঙ্গদেব, সে ঘাটকে আজও লোকে 'নিদয়া ঘাট' বলে।

ওপারে অপেক্ষা করছিলেন প্রভুর পরম ভক্ত মুকুন্দ দত্ত ও তাঁর নিজভৃত্য গোবিন্দ কর্মকার। তাঁর হস্তে রয়েছে প্রভুর জন্য শুকনো কাপড় ও গামছা। ভিজে কাপড় ত্যাগ করলেন প্রভু, সেই সঙ্গে পুরনো মনকেও কি ত্যাগ করে ফেললেন একেবারে? নতুন জীবন, নতুন রূপ প্রভুর। উর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে চললেন সম্মুখের দিকে। সেই উর্ধ্ববাহু দেবপ্রতিম লোকটার মুখে অবিরাম কীর্তন চলেছে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ, যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।

আচ্ছন্নের মত কি একটা ভাবে বিভোর হয়ে, নৃত্য করতে করতে দ্রুত সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন গৌরাঙ্গদেব, সঙ্গীরা এগুতে পারছেন না প্রভুর সঙ্গে।

উর্ধ্ববাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরার মল্ল যেন করিছে গমন॥
রাধার বিরহভাবে হৈয়াছে ব্যাকুল।
কতি কতি রাধা মোর, কোথায় গোকুল॥

এইভাবে চলতে চলতে পৌঁছুলেন সকলে কাঞ্চননগরে।

হাওয়ার বেগে খবর পৌঁছে গেছে কাঞ্চননগরে, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে পথে। ঘর ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে এল পথে কাঞ্চননগরবাসী। সেই উর্ধ্ববাহু অপূর্ব তেজোময় দেবমূর্তির পানে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় ও স্নেহের আকর্ষণে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা দূরে থেকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানিয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে এসেছে গো! কেউ বা বলছে—কি সুন্দর ননীর মত নরম চেহারা গো, কি করে হেঁটে চলেছে এই কঠিন ধূলোর পথে। কেউ বলছে—এই ত বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুর গো, লীলা দেখাতে কলিযুগে নেমে এসেছে।

যে পথ দিয়ে চলে যান গৌরাঙ্গসুন্দর, সেই পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়তে লাগল কত লোক। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। পথে এসে ভিড় করছে গ্রামবাসীরা। কোন বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলছে, কার বাছা গো তুমি! আহা বাছা রে, ঘরে ফিরে যাও, সন্ন্যাসী হয়ো না বাছা। তুমি গেরুয়া পরলে, মাথা মুড়োলে তোমার মা কি করে সহ্য করবে?

নদীর পারে একটা গাছের নীচে বসলেন প্রভু। মুদিত নয়ন দুটির দু'পাশ দিয়ে অঝোর ঝরে জল ঝরে পড়ছে, বক্ষের বসন সিক্ত হয়ে, মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে সে জল। মুখে কেবল 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বাণী। প্রভুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার নর-নারী। তারা গৃহ ভুলেছে, সংসার ভুলেছে, ভুলেছে আপন আপন কাজ।

কয়েকজন ভুক্তভোগী বলাবলি করতে করতে চলে গেল: বোঝাই ত যাচ্ছে কি হয়েছে, জমিদার কেড়ে নিয়েছে ঘর-বাড়ি, তারপর বাড়ি থেকে দিয়েছে তাড়িয়ে।

তখনকার দিনে, সামাজিক যে ব্যবস্থা ছিল সেই ধরনেরই কথাবার্তা সকলের মুখে। ভগবানের জন্য কেউ পথে বেরুতে পারে, এ ধারণাও

ছিল না মানুষের। লোকে ছড়া বলত, পাঁচালী পড়ত, ব্রতকথার বই পড়ে পুজো অর্চনা করত। কিন্তু কৃষ্ণ নাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া, এই সবের সঙ্গে পরিচয় ছিল না কারো।

গৌরাঙ্গের চোখের জলে কোমল হয়ে উঠল লক্ষ লক্ষ নরনারীর মন। এই নবীন সন্ন্যাসীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে বিস্ময়ে ভক্তিতে ও স্নেহে উদ্বেলিত হয়ে উঠল সকলে।

এদিকে শ্রীপাদ চন্দ্রশেখরের ব্যবস্থায় গোরাচাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কলাধর নামে এক ক্ষৌরকার এসে প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করে দিল। তারপর গঙ্গাস্নান করে এসে, নতুন গৌরিক বসন পরিধান করে সর্বাঙ্গে লেপন করলেন চন্দন, গলায় মালা পরে, হাতে নিলেন দণ্ড কমণ্ডলু।

দূরে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি পল্লীবাসীগণসহ সমস্ত কাঞ্চননগরবাসী সেই অপূর্ব জোতির পানে তাকিয়ে রইল সবিস্ময়ে। ভাবে তারা ঃ এ কে? এ কোন্ দেবতা নেমে এলেন ধরণীতে। অবশেষে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হবার সময় এল।

গঙ্গাতীরে কেশব ভারতীর আশ্রম। তারই পাশে নির্মিত হয়েছে বেদী যজ্ঞস্থল বেষ্টন করে। সন্ন্যাসীরা বসে পাঠ করছেন বেদমন্ত্র। গঙ্গার পারে বহুদূর পর্যন্ত জায়গা জুড়ে অগণিত দর্শক দাঁড়িয়ে আছে। তারা অপেক্ষা করছে, কি স্বর্গীয় দৃশ্যই আজ চোখে পড়বে সকলের। হিংসা-দ্বেষ-পাপ-তাপের চিন্তা ভুলে গিয়ে ভক্তিনত পবিত্র মন নিয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে মানুষ। পৃথিবীতেও স্বর্গ সৃষ্টি করা যায়, এ যেন তারই একটা দৃশ্য।

ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করলেন সেই যজ্ঞস্থলে, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে গেরুয়াধারী নদীয়ার গোরাচাঁদ, শচীমায়ের বক্ষনিধি নিমাই নবীন সন্ন্যাসী।

চোখে জল এল দর্শকদের। এই দৃশ্য যত মহান, যত পবিত্রই

হোক, সহ্য করা যায় না। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি। পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদি সমস্ত হলে পর আচার্য কেশব ভারতী গৌরাঙ্গদেবকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করলেন। হরিধ্বনি ও কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠল গঙ্গার ঘাট।

কেশব ভারতী নবীন সন্ন্যাসীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, আজ তোমার নাম হল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

"এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য !
সর্ব লোক তোমা হতে যাতে হৈল ধন্য॥

ছয়
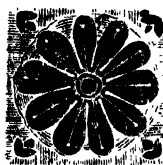
নদীয়া কাঁদছে, কাঁদছে সমস্ত নবদ্বীপবাসী, কাঁদছে বাংলা দেশ। পাড়া প্রতিবেশী বিস্ময়ে স্তম্ভিত। কোথায় গেল গোরাচাঁদ! একটুও বোঝা যায়নি আগে! এমন করে ফাঁকি দিল? মায়ের বুকের দুলাল, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ নবদ্বীপ শূন্য করে কোথায় গেল?

শচীদেবীর পাশে এসে নীরবে বসে থাকে সব, সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের পানে তাকায়। বিষণ্ণ-প্রিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকে। দিন যায়, রাত আসে। বাক্‌হারা দুটি নারী পরস্পরকে অবলম্বন করে নীরবে বসে, বসে, কেবলই কার অপেক্ষায় থাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন শচীদেবী, কেঁদে ওঠেন—নিমাই-রে নিমাই!

চমকে ওঠে সারা নবদ্বীপ। গাছ পালা, আকাশ বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নাই গো, নাই, নাই।

একদিন একদিন করে আবর্তিত হয় দিন, তিথি মাস। শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, উভয়েরই মনে হয় সেই দিনটি তো আবার আসছে, যে দিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের আকাশেও উদয় হয়েছিল নবদ্বীপচন্দ্রের। শচীমায়ের বুকের নিধি নিমাইচাঁদের সেই পুণ্য আবির্ভাবের তিথি তো আসছে, কিন্তু আজ কোথায় তাঁর

ঘরের চাঁদ! অমাবস্যার অন্ধকারে ভরা আজ তাঁর বুক, তাঁর মন, তাঁর সম্মুখের বিশ্ব চরাচর সব।

আবির্ভাব তিথির উৎসবে মেতে উঠল নবদ্বীপ বাসী। শচীমাকে এসে জানিয়ে গেল সে কথা। কি বলবেন শচীমা? বলবার কি আছে। তাঁর সুখ, তাঁর দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে নবদ্বীপবাসী। তাঁর নিমাইকে যারা ভালোবাসে, তারা তো তাঁরও আপনার জন।

বধূকে বললেন, বউমা, সারা নবদ্বীপ মেতে উঠেছে, আমার নিমাইয়ের জন্মতিথিতে নিমাইয়ের নিজের ঘরে কোন উৎসব হবে না?

—কেন হবে না মা? তুমি বললেই আয়োজন করি।

সেদিন উৎসবানন্দে মেতে উঠল নবদ্বীপবাসী। ঘুরে ঘুরে কীর্তন করতে লাগল সকলে। নিমাইয়ের ঘরে শ্রীবিষ্ণুর পদতলে বসে রইলেন সীতাঠাকুরাণী, মালিনী দেবী সহ শাশুড়ী ও বধূ। কীর্তন হচ্ছে, যে কীর্তন নিমাই করত, যে নাম-গান শুনতে শুনতে অজ্ঞান হয়ে পড়ত নিমাই। আজও সেই গান হচ্ছে, কিন্তু নিমাই কোথায়? বধূ অবগুণ্ঠনবতী, আর শাশুড়ী শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন সকলের মুখের দিকে। যদি হঠাৎ এসে পড়ে, হঠাৎ চোখে পড়ে যায় সেই মুখখানি!

নাই গো নাই, সে নাই! মাকে বধূকে ব্যথার সমুদ্দুরে ভাসিয়ে দিয়ে জগতের কল্যাণ করতে বেরিয়েছে সে।

দুঃখে অভিমানে পূর্ণ হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরও। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবে, এ কি রকমের ধর্ম আচরণ! যাকে সারা জীবন প্রতিপালন করবেন বলে ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করেছিলেন, গৃহত্যাগী হয়ে, তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া এ ব্যবস্থা কোন্ ধর্মে আছে? তাঁর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল, তাঁর সেই অনুগতা পত্নীকে কার কাছে রেখে

গেলেন ? এক ধর্মকে তুচ্ছ করে দিয়ে আর এক ধর্ম পালনের জন্য ছুটে যাওয়া, সে আবার কি রকমের ধর্ম পালন ! অভিমানে বেদনায় হাহাকারে লুটিয়ে পড়ে শূন্য শয্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

ঘুরে ঘুরে বৎসর আসে, আবার চলে যায়। শেষ হয় ফাল্গুন। বাগানের গাছগুলো অযত্নেই শুকিয়ে শুকিয়েও বেঁচে আছে কোন মতে। বসন্তের আগমনে সেগুলোতে আবার প্রাণের স্পন্দন জেগেছে, শুকনো ডাল, লতায়-পাতায় মন মাতানো অপূর্ব শ্যাম সমারোহ। এই যে জানালার পাশে রক্ত করবীর ডালগুলো ভরে উঠেছে ফুলে ফুলে, চোখে জল এল ভাবতে গিয়ে যে হাত বাড়িয়ে এই ডালটা থেকে ফুল তুলে তার স্বামী তার মাথায় পরিয়ে দিতেন। কাঁদতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়া। কত ফুল ফুটেছে, ওগো, তুমি আসবে না ?

আবর্তিত হয়ে চলেছে কাল, দিন রাতের চাকা অবিরত ঘুরে চলেছে, কারো পানে ফিরে তাকায় না। শ্রাবণের বারিধারায় ভেসে যাচ্ছে পথ ঘাট, তারই মধ্যে ভিজে ভিজে পথিক চলে পথে। ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে দূরে, দূরান্তরে। কাজের আহ্বানে মানুষ বাইরে ছোটে, পিছু ফিরে তাকায় না। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামীও কাজের ডাকে কর্তব্যের প্রেরণায়ই বাইরে গেছেন। দুঃখ কি ? কাজ হয়ে গেলেই আবার আসবেন, কিন্তু কবে কতদিনে ? শ্রাবণের রাত্রিতে একলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া শয্যায়।

ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি পড়েই চলেছে, বাইরে অন্ধকার। বাগানের গাছগুলো এ ওর গায়ে দুলে দুলে পড়ছে বারবার। বুক কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠছে মেঘ। বিদ্যুতের ঝলকে প্রকৃতির বীভৎস রূপ চোখে পড়ছে জানালার ফাঁক দিয়ে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে,

স্তব্ধ হয়ে দরজার দিকে কান পেতে বসে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি আসেন, যদি দরজায় ধাক্কা দেন, ঘুমিয়ে পড়লে শুনতে পাবে না। বলে যাননি তো কত দেরি হবে। শ্রাবণের দীর্ঘ রাত্রি এই ভাবেই কাটে বিষ্ণুপ্রিয়ার—কখনো জাগরণে, কখনো তন্দ্রায়। কেবল মনে হয়—

"আসে, আসে, আসে .
নীরব দু'টি চরণ ফেলে।"

কিন্তু এল না। শেষ রাত্রিতে লুটিয়ে পড়ে শয্যায়। কেন না বলে চলে গেলে? কেন বলে গেলে না কবে আসবে?

আবর্তিত হয়ে চলেছে কালের রথের চাকা, কেটে গেল বর্ষা। আনন্দময়ীর আগমন, বাদ্য বাজিয়ে এগিয়ে এল আশ্বিন। ঘরে ঘরেও আগমনী বার্তা শোনা যাচ্ছে। প্রবাসীরা গৃহে ফিরছে প্রিয়জনের জন্য নানা উপহার সঙ্গে নিয়ে। গৃহের দ্বারপ্রান্তে বসে তাকিয়ে থাকেন শচীদেবী, এত লোক ফিরছে ঘরে তাঁর নিমাই কি আর ফিরবে না? পার্শ্ববর্তিনী বধূকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন। সেই একই কথা আবার জিজ্ঞাসা করেন—বউমা, কিছু বলে যায়নি সে-রাত্রিতে, কবে ফিরবে, কিছু বলে যায়নি?

বিষ্ণুপ্রিয়া কি উত্তর দেবে? চুপ করে থাকে শুধু।

মাসগুলো কেটে যায় ধীরে ধীরে। পৌষের হিমেলী হাওয়ায় কাঁপন ধরে প্রকৃতিতে। পশু-পক্ষী, গাছের লতা-পাতা, ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসে শুকিয়ে। হিমেলী হাওয়ায় জর্জরিত মানুষও সন্ধ্যা হবার আগেই আশ্রয় নেয় আপন নিভৃত গৃহে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আবরণহীন মুক্ত গায়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, কত শীত কত ঠাণ্ডা দেখি তো একবার পরীক্ষা করে। সুখের

ঘর ছেড়ে কোথায় আজ তার সন্ন্যাসী স্বামী? দিনান্তে একটু ক্ষুধার অন্ন তাও কি ভিক্ষে করে খেতে হয়?

বস্ত্রহীন, অনাবৃত হিমজর্জর ক্লান্ত দেহ, কিন্তু হয়ত সে বোধও নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অন্ধকারের পানে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। মধ্য রাত্রির কুয়াশা সূচের মত গায়ে এসে ফোটে, কাঁপন লাগে গায়। তা হোক!

দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, একদিনের কথা মনে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে, শয্যায় স্বামী নেই। খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বে দু'টি আঁখি মেলে তাকিয়ে আছেন। কোথায়, কোথায় সে দৃষ্টি? কোন্ সুদূর শূন্যে? কাছে এসে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন গৌরাঙ্গ।

—কি করছ এত রাত্রিতে?

—শুনতে পাচ্ছ না?

—কি গো?

—কোথা থেকে একটা বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে, শুনতে পাচ্ছ না?

—না তো।

—ঘুমুতে পারলাম না আমি, কেবলই শুনছি—আয়, আয়, আয়।

—কি যে বলছ তুমি, কে ডাকবে এত রাত্রিতে, স্বপন দেখেছ। চল চল, শোবে চল।

—আমি কি দেখেছি জান? সুদর্শন চক্র চলছে, ঘুরছে—কেবলই ঘুরছে। কিচ্ছু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ধনীর অত্যাচার, সমাজপতিদের অত্যাচার, কিছু আর থাকবে না।

ভীত হয়ে স্বামীকে দুই বাহুতে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে শয্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখ বুজে বসে থাকেন স্বামী, বসে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়াও।

একদিন নয়, কতদিন এরকম হয়েছে। দুই চোখে জলের ধারা বইতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়ার। ওগো, ঘরে বসেই তো তুমিও বাঁশী বাজিয়েছ এত কাল, তোমার সংকীর্তনের সুরে ছুটে এসেছে অনাথ কাঙ্গাল। কেন তবে বাইরে গেলে?

সাত

ঘুরে গেল বৎসরের চাকা। সহসা একদিন খবর এল, গৌরাঙ্গদেব ফিরে এসেছেন নীলাচলে। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ তাঁর শেষ হয়েছে।

খুশির উদ্দীপনায়, উৎফুল্ল আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল ভক্তেরা। খবর দিল এসে শচীদেবীকেঃ মাগো, তোমার নিমাইচাঁদ ফিরে এসেছে নীলাচলে।

গভীর বেদনা ও ঔৎসুক্যে হঠাৎ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন মা। তারপর বললেন, এসেছে? বাড়ি আসবে না?

—কত দেশ জয় করে এসেছে মাগো, কত ভক্ত তার পিছু পিছু ঘুরছে রাতদিন। বাড়িতে আসবে বৈকি মা, সময় হলেই আসবে। তোমার কাছে আসবে না!

অবাক হয়ে মা ভাবেন—সময় হলে আসবে! কবে হবে সেই সময়! এখন আর তাঁর নিমাই তাঁর একলার নয়, সকলের। সে শুধু একটা সংসারে আটকে থাকবে না, সে সারা দেশের, সারা পৃথিবীর। বউমাকে ডেকে বলেন—দেখো বউমা, আমার একলার বুকে আর কতটুকু জায়গা ছিল তাকে ধরে রাখবার। সারা পৃথিবীর লোক এখন তাকে মাথায় করে রেখেছে, এটাই তো ভাল হল, তাই না মা?

বউমা ধীরে ধীরে বলে—তাই তো মা। বধূ জানে, এটা নিজের মনকে এবং বধূকে মিথ্যে আশ্বাস দেবার একটা ছলনা মাত্র।

সমস্ত নবদ্বীপবাসী উৎসাহে অধীর হয়ে উঠল। ভক্তেরা সকলে নীলাচলে যাবে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। পরম উৎসাহে শচীদেবীকে বলে সবাই—মাগো, আমরা যাচ্ছি। কতকাল দেখিনি মা গৌরাঙ্গকে, এবারে যাচ্ছি, দেখতে যাচ্ছি। আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছলেন, এবার আর ফাঁকিতে পড়ব না।

—আমরা যদি কিছু খাবার করে দিই, নিয়ে যেতে পারবে তো তোমরা সে-সব ?

সবাই পুলকিত হয়ে রাজী হয়ে গেল। গৌরাঙ্গের জন্য কিছু বহন করে নিয়ে যাওয়া, সে তো পরম ভাগ্যের কথা।

শাশুড়ী, বধূ বহুদিন পরে অত্যন্ত খুশী হয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। কি সে ভালোবাসে, কি নিয়ে যেতে পারবে, এত দূরের পথে বহন করে ওরা, ভেবে ভেবে অধীর হয়ে উঠলেন মা। প্রস্তুত হল সব। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রের তাপ উপেক্ষা করে দল বেঁধে সকলে চলল দীর্ঘ পথের সকল কষ্টকে তুচ্ছ মনে করে যাবার সময় মা বলে দিলেন ওদের—নিমাইকে বলবে একবার যেন দেখা দিয়ে যায়। ওর সন্ন্যাস ধর্মের ব্যাঘাত হয় এমন কোন কাজ আমরা করব না।

দীর্ঘকাল পরে দর্শন পেল ওরা, ওদের প্রাণাধিক প্রিয় নদের নিমাই, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের। কিন্তু কি অপরূপ সুন্দর চেহারা! কি দেবোপম মূর্তি! স্তম্ভিত হয়ে রইল ওরা। আর নিমাই ? নিমাইয়ের বুকটা তো পাষাণ দিয়ে তৈরী নয়! তার শৈশবের বন্ধুদের, তার কৈশোরের সহপাঠীদের, তার বৈরাগ্যের দিনের বন্ধুদের পানে তাকিয়ে মনে কি তার একটুও আকুলতা জাগল না ? মায়ের খাবার হাতে নিয়ে দুই চোখে তার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে

যখন সে খাবার খেতে বসল, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে, মায়ের হাতের স্পর্শ কি সে পেল না? ক্ষণকালের জন্যও মন তার উচাটন হয়নি কি?

পুরীতে কাশী মিশ্রের ভবনে গৌরাঙ্গদেবের আবাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আসন্ন রথযাত্রার সময়, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দু'শো ভক্ত এল গৌড় থেকে, —এল আরও বহু ভক্ত নানা দেশ থেকে বহু দূরের পথ বহু কষ্টে অতিক্রম ক'রে। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র সকলের সুখ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করবার জন্য মন্ত্রীদের আদেশ করেছেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর এখনো হয়নি। রাজার রাজবেশ যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন প্রভু দর্শন দেবেন না রাজাকে। প্রতাপ রুদ্র বিষণ্ণ হয়ে বলেন—জগাই, মাধাই পর্যন্ত উদ্ধার পেয়ে গেল প্রভুর কৃপায়; প্রতাপ রুদ্র পাবে না প্রভুর সে দয়া? সমস্ত জগৎ উদ্ধার হয়ে যাবে, উদ্ধার হবে না শুধু প্রতাপ রুদ্রের? তবে এই জেনে রাখ সার্বভৌম, প্রভুর যেমন প্রতিজ্ঞা রাজবেশীকে তিনি দর্শন দেবেন না, আমারও এই প্রতিজ্ঞা রইল, প্রভুর দয়া আমি পাবই। তা নইলে আমি দেহত্যাগ করব।

গৌরাঙ্গদেবের কাছে সে কথা তুললে তিনি রুষ্ট হন, বলেন—জগন্নাথের সেবক, ভক্তিমান, সবই সত্য, কিন্তু তার রাজবেশের ভিতরে যে আড়ম্বর রয়েছে, তা আমার সহ্য হবে না। আবার যদি ও কথা তোমরা বল, আমি নীলাচল ত্যাগ করে চলে যাব।

সুতরাং প্রতাপ রুদ্রের সকল আশা অন্তর্হিত হল। বিষণ্ণ বদনে বললেন—রাজ্য আমি ত্যাগ করব সার্বভৌম, কি হবে আমার রাজমুকুটে, বিলাস বৈভবে, প্রভুর দয়াই যদি না পেলাম!

একদিন রাত্রি শেষে, রক্তিম উষার আলোয় যখন গৌরাঙ্গদেবের কক্ষখানি স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে উঠেছে, তখন রামানন্দের হাত ধরে একটা সুন্দর কিশোর এসে গৌরাঙ্গদেবের আসনের সম্মুখে দাঁড়াল।

ধ্যান শেষে চক্ষু উন্মিলন করেই প্রভু সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এ কে? কে এই কিশোর? সহসা এর পানে তাকাতেই কি একটা পূর্বস্মৃতি মনে জাগে কেন?

রামানন্দ বললেন—প্রভু, মহারাজ প্রতাপ রুদ্র তাঁর ছেলেটিকে আপনার মনের মত তৈরি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর রাজবেশ নেই, রাজমুকুট নেই, আপনি একে গ্রহণ করুন। মহাপ্রভু তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে।

> সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
> কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥
> পীতাম্বর ধরে অঙ্গে, রত্ন আভরণ।
> কৃষ্ণ স্বরূপের তেহো হইলা উদ্দীপন॥
> তবে দেখি প্রভুর পূর্ব স্মৃতি হৈলা।
> প্রেমাবশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা॥
> এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
> ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে॥
> কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
> এতবলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে॥

প্রতাপ রুদ্র পুত্রকে দেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তাঁর পুত্র মহাপ্রভুর স্পর্শলাভ করেছে, জীবন তাঁর সার্থক হয়ে গেছে। মনে তাঁর গভীর বৈরাগ্য, কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়। কেমন করে তবে প্রভুর সঙ্গলাভ করব!

দিনে দিনে মহারাজের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অহঃরাত্র কেবল তাঁর একই চিন্তা—কেমন করে, কেমন করে প্রভু, আমি তোমার দর্শন লাভ করব!

কিন্তু অবশেষে সেই শুভদিন উপস্থিত হল, প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার দিন এল মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের।

এল রথযাত্রা। ভক্ত সমাগমে পুরীর পথ ঘাট লোকে লোকারণ্য। স্বয়ং মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে গুণ্ডিচার মার্জনা সম্পন্ন হল। বামদিকে নারিকেল বন, দক্ষিণে সুরভিত সুন্দর পুষ্পোদ্যান, রথ সেখানেই দাঁড়াবে।

অবশেষে রথের যাত্রার সময় এল, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে সোনার সম্মার্জনী দিয়ে পথ ঝাড়ু দিলেন মহারাজ প্রতাপ রুদ্র। সুগন্ধী জল সিঞ্চন করে পথকে শীতল করে দিলেন। তারপর আরম্ভ হল যাত্রা। রথের আগে আগে, সমস্ত পথ আলোকিত করে, প্রভু প্রেমাবেশে আকুল হয়ে নেচে চলেছেন। তাঁর সর্ব অঙ্গ হতে তখন এক অপূর্ব জ্যোতির বিকীরণ হচ্ছে। সে অপূর্ব আলোয়, ধূপ-ধুনোর সুবাসিত ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ভক্তদের চক্ষুর সম্মুখে এক অপূর্ব দৃশ্যের উদ্ঘাটন হল, মনে হল রথের উপরের দেবতা কি পথের উপরের দেবতার অঙ্গে বিলীন হয়ে গেলেন? জয়ধ্বনি করে উঠল পথচারী পুণ্যার্থীর দল।

রথ চলেছে, চলেছেন প্রেমাবেশে অধীর গৌরাঙ্গ, চলেছে কত লোক, কত শত শত, কত সহস্র। অবশেষে রথ এসে পৌঁছুল সেই পুষ্পোদ্যানে। অধীর নর-নারীর আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল পুষ্পোদ্যান। প্রেমাবেশে আচ্ছন্ন অবস ক্লান্ত দেহ গৌরাঙ্গ জনতার ভিড় থেকে সরে গিয়ে পুষ্পোদ্যানের একান্তে একটি গৃহে প্রবেশ করে মাটিতেই শুয়ে পড়লেন, ক্লান্ত চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল।

বাইরে তখন জগন্নাথ দেবকে ভোগ দেওয়া চলছে। প্রথমে রাজা, রাজমহিষী, অমাত্যবর্গ এবং পরে জনতার ভক্তি নিবেদন চলছে জগন্নাথ দেবকে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। রাজা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মন তাঁর চঞ্চল, আজ যদি সুযোগ না হয় তবে আর কোনদিন হবে না। গৌরাঙ্গ দেবের পাদস্পর্শ করবার সুযোগ আজ তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। তারপর? তারপর আশ্চর্য এক দৃশ্য।

আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বেহন॥
রামলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনতি শুনতি প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বুলি উচ্চ বোলে বার বার॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।...

হাতে ভগবত, চোখে তাঁর অবিরল জলের স্রোত।

—প্রভু আমি প্রতাপরুদ্র, দেহে আমার রাজবেশ নেই, আমি রাজা নই, আমি বৈষ্ণব, তোমার সেবক। পদতল থেকে তুলে নিয়ে প্রভু আবার আলিঙ্গন করলেন তাঁর এই মহাভক্তকে। বাইরে তখন জনতার জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল নীলাচলের আকাশ বাতাস।

নবদ্বীপের ভক্তরা এখনো প্রভুর সঙ্গেই আছে। সম্মুখে আসছে জন্মাষ্টমী, সে উৎসব দেখে তারা ফিরবে দেশে। দেশে শচীমাতা আকুল হয়ে তাদের পথ চেয়ে আছেন।
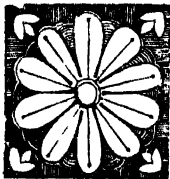
আট

দিন মাস ঘুরতে ঘুরতে আবার একটা নতুন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল নীলাচলে। এবারে আসছে জন্মাষ্টমীর উৎসবের দিন, যে দিন সমস্ত ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে, রুদ্ধ কারাগারের দ্বার মুক্ত করে দিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। আজও সেই দিনের কথা ভোলেনি মানুষ, হৃদয় মনের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে দিয়ে তাঁকে পুজো করবার সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকে মানুষ।

এসেছে সেই আকাঙ্ক্ষার দিন নীলাচলবাসী হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিবেদন ক'রে জন্মাষ্টমীর পুজোয় মগ্ন হয়ে গেল। পুজো শেষে রাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ে বহুমূল্য একখানি প্রসাদী বস্ত্র নিবেদন করে দিয়ে ভক্তি প্রণত চিত্তে পায়ের কাছে বসে রইলেন। কীর্তনানন্দে বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গ তা তাকিয়েও দেখলেন না। যখন সজ্ঞানে ফিরে তাকালেন, বিস্মিত হয়ে বললেন—এ কি?

রাজা তখন প্রভুকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে, বেরিয়ে গেছেন বাইরে। নিত্যানন্দ বললেন, প্রভু, ভক্ত প্রণামী দিয়ে গেছে, গ্রহণ কর।

অসহায়ের মত বললেন প্রভু, এ বস্ত্র আমি কি করব—মার, কাছে পাঠিয়ে দাও।

কথাটা মনঃপূত হল নিত্যানন্দের। নবদ্বীপবাসীরা সানন্দে সে বস্ত্র নিয়ে ফিরে চলল দেশে। মনে মনে পুলকিত হল ওরাও। এই বহুমূল্য শাড়িখানি মা যে নিজে পরবেন না, গৌরাঙ্গদেবও জানেন সে কথা।

সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের মনের কোণায় এখানো কি একটু পূর্বাশ্রমের প্রতি আসক্তি আছে ! কীর্তন এবং ধ্যানের স্বল্প ফাঁকটুকুতে আর কারো কথা মনে একবারও কি উঁকি দেয় না ? শাড়িখানি হাতে নিয়ে দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে বুঝবে, এখনো বিস্মৃত হননি তার স্বামী তাকে। ঐ নিরাসক্ত মনের কোণায় এখনো একটু স্থান তার জন্যে আছে কি ?

বার্তাবহরা ফিরে এসেছে। একদিন নয়, দু'দিন নয় কতদিন ধরে ওদের কাছে শোনেন শচীমাতা তাঁর নিমাইয়ের কাহিনী। শুনে শুনে কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। আর পার্শ্বোপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী বধূ নীরবে শোনে সব কথা। মা মাঝে মাঝে ডেকে বলেন— শুনেছ বউমা, নিমাই আমার তেমনই আছে, তেমনই ভালোবাসে আমাদের। আমাদের কথা তেমনই মনে করে এখনো। গুরুর আদেশ বলে ঘর ছেড়ে যেতে হয়েছে, তা নইলে কি আর যেত ? তাই না বউমা ? শাশুড়ীর কথাগুলো কাণের পর্দা থেকে বুকের পর্দায় গিয়ে বাঁশীর মত বাজতে থাকে।

দূরকে আর দূর বলে মনে হয় না। দূরত্ব আর রইল না। নিমাইকে ছেড়ে থাকতে পারে না ভক্তরা, আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত দেশ ত্যাগ করে বার বার চলে যাওয়াও সম্ভব হয় না। তথাপি কোন কিছু উপলক্ষ করেই দল বেঁধে ওরা চলে যায় নীলাচলে, নবদ্বীপ আর নীলাচল, নীলাচল আর নবদ্বীপ। ওদের আসার প্রতিক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকেন দ্বারপ্রান্তে শচীদেবী। পাশে বসে থাকে ধ্যানগম্ভীর-মূর্তি বধূ। পথ চেয়ে বসেই থাকেন শচীদেবী, মনে মনে তাঁর একটাই প্রশ্ন—একবারও কি ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করে না নিমাই ? একবারও কি বলে না আমার মা—আমার বউ—ভাল আছে তো ওরা ?

ভক্তরা ফিরে আসে নীলাচল থেকে মহা উল্লসিত ওরা। ওদের কথা শুনে শুনে পুত্রকে যেন চোখের সম্মুখেই দেখতে পান। চোখে আসে জল, মুখে ফোটে তৃপ্তির ছায়া।

এমনি করে দিন যায় মাসও যায়। মাসের পরে মাসের শেষে আবার একদিন নামল শ্রাবণধারা। আকাশ ভেঙ্গে বাদলের ধারায় থৈ থৈ করছে পথ ঘাট, ঝড়ের শব্দে, বজ্রপাতের শব্দে গৃহস্থের ঘরে শয্যায় চমকে ওঠে শিশুর দল। মায়েরা বুকে চেপে ধরেন তাদের।

শচীদেবী শয্যায়, ঘুম নেই তাঁরও চোখে, মনে ভেসে আসে কবেকার কোন্ কথা। কোন্ ঝড়ের রাতে, 'কোন্ বাদলার অন্ধকারে কীর্তনের শেষে বাড়ি ফিরত তাঁর নিমাই—নিজ হাতে তার মাথা মুছিয়ে দিয়ে, বধূকে নির্দেশ দিতেন—শুকনো কাপড় এনে দাও বউমা! খাবার গরম কর তাড়াতাড়ি। হায়রে, আজ কোথায় সেই সন্ন্যাসী। কীর্তন করতে করতে, কোথায় কোন্ গাছতলায় মাঠে ঘাটে কোন্ বারান্দার কোণে বসে বসে ভিজছে। কে আর দেবে শুকনো কাপড়, কে মুছিয়ে দেবে মাথা! বসে বসে চোখের জলে ভাসেন কেবল মা।

ঘুম নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখেও। জানালা খুলে রেখে, ভাদুরে আকাশের তাণ্ডবলীলার পানে তাকিয়ে থাকে স্থিরদৃষ্টিতে। ঘরে জল আসছে, বিছানা ভিজে যাচ্ছে. যাক—খোলা থাক জানালা, যদি হঠাৎ এসেই পড়েন, বন্ধ দরজা দেখে ফিরে যান যদি। বিদ্যুৎ চমকিত শূন্য পথে শুধু ভাদুরে আকাশের ঝির ঝির বাদল ধারা আর উচ্ছ্বসিত জলের প্লাবন। ঘুম নেই, কিন্তু শেষ রাত্তিরে অবসাদে আচ্ছন্ন দেহ এলিয়ে পড়তে চায় শয্যায়, তুই চোখে বইতে থাকে শ্রাবণের ধারা। হাত দু'টি জোড় করে বলতে থাকে—কেন না বলে চলে গেলে? আমি কি বাধা দিতাম? বুড়ো মাকে এমনি করে অসহায় করে ফেলে রেখে, হতভাগিনী আমাকে ত্যাগ করে তোমার কোন্ ধর্ম সাধিত হচ্ছে?

অবিশ্রান্ত বারিপতনের ঝর ঝর শব্দের ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে দু' তিনটে দিন আর রাত। শচীদেবী বসে থাকেন দরজার পাশে, তাকিয়ে থাকেন পথিকদের দিকে। জল আর কাদার উপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে ছাতা মাথায় চলেছে, দু' চার জন একটু

দূরে দূরে। কেউ কেউ ছাতাটা একটু কাত করে ধরে মাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলে যায়। মা শূন্য দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে থাকেন।

আলোহীন কান্নাভেজা দিনগুলো কেটে গিয়ে একদিন সকালে সূর্য দেখা দিল আকাশে। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে কাছে এসে বলল—মাগো, ওঠ, নাইতে যাবে না ?

শূন্য দৃষ্টি ধূবর মুখের পানে তুলে তাকিয়ে থাকেন মা, তারপর সহসা বধূকে কাছে টেনে নিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বধূ মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কিন্তু এ দুঃখের দিনগুলোও একদিন একটু রং বদলায়। খবর এল, গঙ্গার ওপারে কুলিয়ায় প্রভাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। নীলাচল থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ এসেছেন সেই উৎসবে যোগ দিতে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল একুল ওকুলের যত জনপদবাসী। চারপাশের অগণিত লোকজন এসে কুলিয়ার সুবিস্তীর্ণ নদীর চরে জমা হতে লাগল। জনতার উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনিতে এপার ওপারের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল সুদূর দিগন্তে। নবদ্বীপের গঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে, অগণিত নরনারী বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য। কুলিয়া আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, তিনি যে তাদেরই নিমাই, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ।

ভক্তেরা ছুটে গেল শচীদেবীর কাছে : মাগো, কালিয়ার মাঠ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে তোমার নিমাই। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সে মাঠ, মনে হচ্ছে যেন ওকেই পুজো করছে সবাই, দেখবে না মা ? এস, এস।

কম্পিত দুরু দুরু বক্ষে শচী বধূর পানে তাকিয়ে বললেন—সত্যি নাকি বউমা ?

বধূর চোখে বিস্ময় নেই, মনে প্রত্যয় নেই, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু।

ভুল করেনি তো ওরা ? সত্যি কি নিমাই ফিরে এসেছে ?

বধূর হাত ধরে শচীদেবী চললেন গঙ্গার পারে, লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়, এপারে ওপারে। আহা তাই তো গো, তাই তো, কি দৃশ্য দেখালে শ্রীবিষ্ণু ? ও কি আমার নিমাই ?

লক্ষ লোকের জয়গানের মাঝখানে সুঠাম, সুন্দর অপরূপ গৌরবরণ তাঁর নিমাই। আনন্দে ভরে গেল মায়ের বুক। দুই চোখে বইতে লাগল আনন্দের ধারা। তাকিয়ে রইল বিষ্ণুপ্রিয়াও—ইনিই তার স্বামী! এই মহাপুরুষ—আমি কি করে ওঁর সান্নিধ্য কামনা করি! শ্রীবিষ্ণুর পায়ে যাঁর দেহ-মন সমর্পিত সেখানে আমি কত তুচ্ছ, কত ছোট! তিনি দেবত', তাঁর নাম জপ করেই আমি জীবন কাটিয়ে দেব।

কিন্তু, তবু—তবু মন শান্ত হতে চায় না। শ্রীবাসকে বললেন শচীদেবী—একবার আমার কাছে আনবে না আমার নিমাইকে ?

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন শ্রীবাস—আসবে, আসবে তোমার নিমাই, খবর পাঠিয়েছে. দশমীর দিন আসবে নিমাই তোমায় দেখতে।

তারপব থেকে কি আকুল প্রতীক্ষা। কখন আসবে দশমীর তিথি ?—বউমা, দেখ না একবার তিথিটা পাঁজিটা খুলে।

—দেখেছি মা, বললাম তো তোমায়, ভুলে গেছো তুমি ?

বিরক্ত হয়ে বলেন শচীদেবী—তোমার তো ভুলও হতে পারে মা, আর একবার দেখ না।

চোখে জল আসে বধূর, হায়রে মায়ের এত আকুলতা, ছেলে তা জানবেও না।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাত্রি প্রভাত হল। এল বিজয়া দশমীর তিথি। গভীর দুঃখের সঙ্গে শুনলেন শচীদেবী, তাঁর নিমাই এসেছে, কিন্তু তার নিজের ঘরে নয়। উঠেছে সে বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে। বুক ফেটে যেতে লাগল মায়ের—ওরে নিমাই, আমি যে তোর মা। এমনি করে আমাদের দূর করে দিলি!

আর অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ? শরাহত হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করতে

করতে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হতে লাগল—আমি কি তাঁর এমনই পরিত্যক্তা হয়ে পড়েছি ? ওগো, তুমি যে সারা পৃথিবীতে প্রেম বিলিয়ে উদ্ধার করছ সকল মানুষকে, আমি কি তোমার পৃথিবীছাড়া ?

আর নিমাই ? নিমাইয়ের মনের কথা কে বুঝতে পারে ? কি বিপ্লব চলেছে তাঁর অন্তরের ভিতর, সে কথা প্রকাশ করবার কোন উপায় নেই। নিজের সমস্ত সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য, ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাববার তাঁর অবসর কোথায় ? মনের ভিতর তাঁর যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, মনের ভিতরেই তাঁর যে বিপুল শক্তি আছে, তা দিয়েই তাকে তিনি জয় করে নেবেন।

বাচস্পতির ঘরে ক্ষণিকের বিশ্রাম সেরে, বেরিয়ে পড়লেন নিমাইচাঁদ, সারা নবদ্বীপকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার জন্য। এই সব পরিচিত পথ ঘাট, কত পরিচিত গ্রামবাসীরা। ছোট ছোট বালক-বালিকা কিশোররা পথের পাশে থেকে তাকিয়ে রইল বিস্ময়ের সঙ্গে। নিজেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমাদেরই গাঁয়ের নিমাই ঠাকুর, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। গ্রামের চাষাভূষো, গোয়ালা, রাখাল, যে যার কাজে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তাদের গাঁয়ের গৌরাঙ্গ ঠাকুর এখন সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

সমবয়সী বন্ধুরা কাছে এসে দাঁড়াল, করুণ ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কেন ভাই সংসার ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে গেলে ? গ্রামকে পর করে দিয়ে চলে গেলে একেবারে ?

উদ্বেলিত হৃদয়ে, চোখে বাষ্পাকুল তাকিয়ে থাকেন গৌরাঙ্গ।

ভাষা নেই মুখে, বলবারও কিছু নেই। তাকিয়ে থাকেন গৌরাঙ্গ গ্রামের পথ ঘাট, বাগান, পুকুর, ফল-ফুলের বাগানের দিকে। কি মায়া জড়ানো! কি আপনার সব! এদের কি ভোলা

যায়? বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে যে সব, ভাষা নেই এদের। প্রসারিত হৃদয়টার মৌল আকর্ষণে কেবলই কাছে টানতে থাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন নিজ গৃহের দিকে. কি দেখবেন সেখানে গিয়ে? কিভাবে কাছে এগিয়ে আসবেন মা? এতটুকু ভক্তি কি শিথিল হয়েছে তাঁর মায়ের প্রতি? সমস্ত বুক জুড়ে যেন মায়ের ছবি আঁকা। আর—আর তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া? অন্তরের অন্তস্থলে তার যে স্থানটি, এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি সে সেখান থেকে। কিন্তু সে কথা এ জীবনে আর প্রকাশ করা হবে না।

আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ, এ বাড়ি সে বাড়ির পাশ কেটে কেটে চলেছে নিমাই। গ্রামের কন্যারা, অবগুণ্ঠনবতী বধূরা কাজ ফেলে ছুটে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে, বিস্মিত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে, আহা! কেন এরকম সন্ন্যাসী হল গো? শচীমায়ের মতন এমন মা যার ঘরে, আর এমন বউ, রাধারাণীর মত রূপ যার? ছল ছল করতে লাগল বধূদের চোখ।

চলেছেন গৌরাঙ্গ, অত্যন্ত শ্লথ মৃদুগতি, মুখে একটা শান্ত সৌম্য ভাব, কিন্তু বুকের ভিতর যে কি তীব্র আলোড়ন, সে খবর এ জীবনে কেউ কোনদিন জানবে না। গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন নিমাই। অত্যন্ত বেদনাভরা মন নিয়ে দেখলেন—গৃহ কোথায়, এ যে একটা পোড়ো বাড়ি! একলা নিমাই নেই, বাড়ি কি তাতেই খালি হয়ে গেছে? গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসকে প্রাণপণে চেপে রাখলেন নিমাই।

অগণিত ভক্ত তাঁর দাঁড়িয়ে আছে পশ্চাতে—কি হবে, কি হবে ভেবে তাদেরও বুকের ভিতর একটা ভয়ার্ত কম্পন! ভিড়ের ভিতর

থেকে কে একজন একটু এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল—মা মাগো, তোমার নিমাই এসেছে যে!

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে, উন্মাদিনীর মত বেরিয়ে এলেন মাঃ কই? কই? কই, আমার নিমাই কই? চক্ষুর সম্মুখে গৈরিকে সর্বাঙ্গ আবৃত শুধু একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি, নিমাই কোথায়? লুটিয়ে পড়লেন শচীদেবী পথের ধূলায়। বুকের উত্তাল সমুদ্র কঠোর শাসনে স্তব্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন নিমাই। নির্বাক জনতা স্তম্ভিত বিস্মিত। কেবল তাদেরই চোখের জলে ভিজে গেল পথের ধুলো।

পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়া জ্ঞানহারা মায়ের পানে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। আর—আর—কি কেউ আসবে না? এ জীবনের মত শেষ দেখা আর হবে না। ছদ্মবেশী মন যতই উদাসীন হবার ভান করুক, হৃদয়কে অস্বীকার করা চলে না।

মুক্ত দ্বারপ্রান্তে একটুখানি আড়ালে দেখা যায় একখানি সাড়ির প্রান্তভাগ। অবগুণ্ঠনখানি একটুখানি উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী বধূটি। অন্তরাল থেকে স্বামীর মুখখানি দেখবার কি ব্যাকুল প্রয়াস তার!

জনতার জলভরা ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখে বেরিয়ে এল সেই অসূর্যম্পশ্যা বধূটি। মলিন বসনা, নিরাভরণা, অবগুণ্ঠনবতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে এসে লুটিয়ে পড়ল।

—তোমার পথ তুমি দেখেছ, আমার পথ কি বলে দাও?

মৃদু আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল জনতার ভিতরে কেউ কেউ। এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়?

নিমীলিত নয়নে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সম্বরণ করে নিলেন নিজেকে।

কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে ডাকলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি সন্ন্যাসী, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, আমাকেই পাবে। আমিও যে শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে তোমাকেই দেখতে পাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চোখের জলে সিক্ত মাটির উপর দিয়ে চলে গেলেন সন্ন্যাসী।

সংজ্ঞাহীন বিষ্ণুপ্রিয়া যখন মাথা তুললেন, দেখতে পেলেন স্বামী চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন পাদুকা দুটি তাঁর মাথার কাছে।

নয়

সেই দিনই বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন গৌরাঙ্গ। পরিত্যক্ত জীবনকে এবারে একেবারেই পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। বিশ্রামের সময় নেই, আত্মচিন্তা করবার অবসর নেই গৌরাঙ্গের। বুকের ভিতর তাঁর অহঃরহঃ কেবলই দৈববাণী বাজে—সম্ভবামি যুগে যুগে। যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি হবে, তখনই যে আমার অভ্যুদয় পৃথিবীতে। গৌরাঙ্গ! এই তো তোমার কাজের সময়!

সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ চলে গেলেন, কিন্তু ভুলতে পারলেন না দুঃখিনী মা ও অভাগিনী পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালনের কথা। শিষ্য দামোদরকে রেখে গেলেন তাঁদের সেবার জন্য। মাঝে মাঝে দামোদর নীলাচলে প্রভুর কাছে গেলে, বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশানকে মাতা ও পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে রাখলেন।

দামোদর যখন নীলাচল থেকে প্রভুর সংবাদ নিয়ে আবার ফিরে আসেন, সঙ্গে আনেন রাজা প্রতাপ রুদ্রের ভক্তির দান একখানি বস্ত্র। গৈরিকধারী শ্রীগৌরাঙ্গ সেই বহুমূল্য বস্ত্রখানি পাঠিয়ে দেন নবদ্বীপে মায়ের কাছে। মা জানেন সবাই জানে, জানে বিষ্ণুপ্রিয়াও—যে বস্ত্র কার। প্রিয়তমের হাতের মধুর স্পর্শ মাখানো রয়েছে সে বস্ত্রে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পুলককম্পিত হৃদয়ে পরম যত্নে সে বস্ত্র গ্রহণ করে।

শচীদেবী তাকিয়ে থাকেন বধূর সজ্জিত দেহের দিকে। চোখে তাঁর জল, মুখে মৃদু ম্লান হাসি। সন্ন্যাসী হলে কি হবে, নিমাই ভোলেনি তাঁদের আহা তার মনেও কে জানে কত ব্যথা!

বধূর চোখেও জল আসে। সে জল গোপন করতে সে পালিয়ে যায় তার শয়নমন্দিরে।

দামোদরকে গৌরাঙ্গের খবর কত বার জিজ্ঞাসা করেও যেন মা তৃপ্তি পান না। সারাদিন সে কি করে। খাওয়া-দাওয়া করে ত? কে রেঁধে দেয়? কে যত্ন করে? দামোদরও প্রভুর কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যায়। তৃষিত মায়ের আকণ্ঠ পিয়াসা মেটাতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। দ্বারের পাশে আর একজন শ্রোতা যে নীরবে বসে আছে, সে কথা ওদের অবিদিত নেই।

এমন করে ঋতুর পর ঋতু যায়—সে নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী আর আসেন না। শচীদেবীর জীর্ণক্ষীণ তনু ক্রমে একেবারে শয্যার সঙ্গে মিশতে থাকে, মনটা তবু সেই পাষাণের খবরের জন্য উৎকর্ণ হয়েই থাকে। দামোদরকে বলেন—দামোদর, একবার কি এসে শেষ দেখাও দেখে যাবে না?

দামোদর আশ্বাস দেয়—আসবে মা আসবে। তোমার অসুখের খবর পেলে আসবে না? জানো মা, এখান থেকে গেলে পর তোমার কথা কি করে যে জিজ্ঞাসা করে, কেবল মা, মা, আর মা।

কেঁদে আকুল হন শচীদেবী। অদ্বৈত গৃহিণী সীতা ঠাকুরানী, শ্রীবাসের পত্নী মলিনা দেবী, শচীদেবীর সখীরা এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—কার জন্যে দুঃখ করবে শচীরানী, ওকি তোমার? ও যে দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ রূপান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে জন্মেছে—সেই চিহ্নই যে ফুটে উঠেছে—যারা চিনতে পারে, তারাই চিনেছে, এ তত্ত্ব আমরা শুনেছি আচার্যঠাকুরের কাছে। তোমার কোলে বড় হয়ে উঠেছে তোমার নিমাই। এখন তার সময় হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে। সমস্ত পৃথিবীতে যার কাজ, সে তোমার এই ছোট ঘরে আটকে থাকবে কেন!

তবু তোমার নিমাই তোমাদের ভোলেনি বোন, এখনও তোমাদের সে ভালোবাসে। এই কথা মনে করে নিজেকে ধন্য মনে কর, দুঃখ কর না। আমরাও ভাগ্যবতী, ওকে দেখেছি, কোলে করেছি, আদর করেছি। তোমরা শান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কর। সান্ত্বনা পাবে, মনকে শান্ত কর বোন।

মন শান্ত হবে, শান্ত্বনা পাবেন শচীদেবী, তা-ও কি সম্ভব। সে কৃষ্ণ হোক, চৈতন্য হোক, ভগবান হোক তাতে তাঁর কি? সে যে তাঁরই ছেলে, বুকে করে যার যত্ন করেছেন, কোলে করে কত দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষ করেছেন! এখনও কাছে এসে দাঁড়ালে মা ডেকে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে—শ্রীকৃষ্ণ হবে কেন? সে যে তাঁরই ছেলে, তাঁরই নিমাই। রুগ্ন দেহে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন শচী।

বধূ কাছে বসে চোখের জল মুছিয়ে দেয় মায়ের। সে বোঝে না পৃথিবীর সকল জীবের দুঃখ কষ্ট দূর করে বেড়াচ্ছে যে, নিজের ঘরের ভিতরে তার মা যে দুঃখে মরে যাচ্ছে, সে এসে একবার দেখবেও না?

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে সে দামোদরকে বলে—কোন উপায় কি হয় না?

নিরুপায় দামোদর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—যাই, দেখি একবার।

নিরুপায় দামোদর চলে নীলাচলে, যেখানে জীবের কল্যাণ সাধনার মন্ত্রে মগ্ন হয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

নবদ্বীপের ক্ষুদ্র একখানি ঘরের মায়ের বুকের ধন নিমাইচাঁদ, বৃহৎ পৃথিবীতে বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে, ক্ষুদ্র ঘরখানির ক্ষুদ্র দুঃখের কথা তার মনেও পড়ে না!

শীর্ণ দেহ ক্রমে শীর্ণতর হয়ে আসে, চক্ষু দুটি বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে—আসবে, নিমাই আসবে, দামোদর আনতে গেছে তাকে। সারাটা দিন কাটে ব্যাকুল প্রতিক্ষায়। সন্ধ্যের পর সে আশা ক্রমে ম্রিয়মান হয়ে আসে। সন্ধ্যা দীপটি বাইরে জেলে

রেখে চারটি প্রাণী বসে থাকেন। পথের পানে তাকিয়ে বাইরে বংশী-বদন ঠাকুর ও ঈশান, ভেতরে শাশুড়ী ও বধূ। শাশুড়ীর গায়ে হাত রেখে বধূ নীরবে বসে থাকে। মন তার অসীম শূন্যতায় ভরা।

একদিন এই ভাবেই শচীদেবীর ব্যাকুল চক্ষু ছুটি ক্রমে বুজে এল চিরদিনের তরে। সে-চক্ষু আর কোনদিন দৃষ্টি মেলে তাকাল না। বধূ বসে রইল পাশে, পাষাণ মূর্তির মত।

দশ

তারপর ? তারপর এল দিন বদলের পালা। কৃচ্ছ্র সাধনের দিন। পাষাণ মূর্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নেমে এল ঘোর আমাবস্যা। অন্ধকার-নিরন্ধ্র অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঢেকে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহ মন। শাশুড়ী থাকতে যে বৈরাগ্য এতদিন স্পর্শ করেতে পারেনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে, সেই বৈরাগ্য এবারে ছেয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে বাইরে। সেই আনন্দ প্রতিমা, পূর্ণবিকশিত যৌবনা নিমাইচাঁদের প্রিয়াজী এবারে পরিপূর্ণ-ভাবে সন্ন্যাসিনী সাজলেন।

বিষ্ণুমূর্তির পদতলে স্বামীর পাদুকা দুটি সম্মুখে রেখে, ধ্যানমগ্না হয়ে থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, সে ধ্যান কখন ভাঙ্গবে কেউ জানে না। দ্বারে বসে আছে অতন্দ্র প্রহরী বংশীবদন আর ঈশান। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় ওদের—কোন সাড়া নেই, বেঁচে আছেন ত বৌমা।

ধ্যান করতে করতে সহসা কখনো বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে কানে কে যেন বলে ওঠে—এই তো আমি এসেছি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাকিয়ে দেখ, তোমার সম্মুখে। চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখেন বিষ্ণুপ্রিয়া সম্মুখে—শ্রীবিষ্ণুর চক্ষু দুটি যেন হেসে উঠছে, অসীম রহস্যভরা সে চোখ। কি যেন বলবার ইচ্ছে দেবতার, কিন্তু ভাষা নেই। লুটিয়ে পড়েন শ্রীবিষ্ণুর পদতলে বিষ্ণুপ্রিয়া—কেন আমায় এমন করে ছলনা কর ?

কত রাত এমনি করেই কেটে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার। বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে, স্বামীর পাদুকা দুটি বুকের মাঝে রেখে, শ্রীবিষ্ণুর পদতলে পড়ে থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়া। রুদ্ধদ্বার প্রান্তের ওপারে চির জাগ্রত দুটি প্রাণী, দামোদর ও বংশীবদন।

ধূপধুনোর গন্ধে ও ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন ঘরখানি পিলসুজের বাতির মৃদু আলোয় কেমন যেন রহস্যময়। এই প্রায় অন্ধকার ঘরে কে যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়, বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে কানে বলে, বিষ্ণুপ্রিয়া, এই তো আমি এসেছি! আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছি। তুচ্ছ এই পার্থিব সংসারে মিলন আমাদের বেশীদিন হল না, কিন্তু, আপার্থিব সংসারে শীগগিরই আমরা আবার এক হয়ে যাব।

শেষ রাত্রিতে উঠে বসেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীবিষ্ণুর মুখের পানে তাকিয়ে মনে সান্ত্বনা আসে। বুকের মধ্যে বার বার অনুরণিত হতে থাকে সেই বাণী, এক্ষুণি যে বলে গেলেন ঃ বিষ্ণুপ্রিয়া, মনে-প্রাণে অনুভব কর আমায়, এই তো আমি তোমার সম্মুখেই রয়েছি। পলকহীন দৃষ্টিতে শ্রীবিষ্ণুর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে থেকে মন আশ্বাসে ভরে ওঠে ঃ এই তো, এই তো তুমি। তবে কেন ভয়! কেন তবে দুঃখ!

গঙ্গায় স্নান করে এসে, জপ করতে বসেন বিষ্ণুপ্রিয়া, নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করে একটি একটি করে চাউল তুলে রাখেন একটা পাত্রে। এমনি করে তৃতীয় প্রহরে যে ক'টি চাউল হয়, তাই দিয়েই ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেন। বেলা শেষে প্রসাদ পেতে বসেই কানে আসে দ্বারপ্রান্তে ক্ষুধার্তের কান্না ঃ মাগো, প্রসাদ দাও। পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আসেন ভিখারিকে বিষ্ণুপ্রিয়া। ম্লান মুখে দামোদর ও বংশীবদন বলে—মা গো, তোমার ত কিছু খাওয়া হল না।

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানি আলো করে বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন, পেয়েছি বাবা, প্রসাদ পেয়েছি আমি।

এমনি করেই দিন যায়।

ধ্যানে বসে জিজ্ঞেস করেন—আর কত দিন, আর কত দিনে প্রভু পৌঁছুব তোমার কাছে? তন্দ্রায় শোনেন: বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া!

—এই যে এই যে আমি প্রভু।

—কেন দুঃখ কর, হতাস হও, এই তো আমি তোমার সঙ্গেই আছি।

প্রতিদিন এই একই প্রশ্ন, একই উত্তর। আহার নিদ্রা আর ভালই লাগে না, ওই পদতল ছেড়ে উঠতেও আর ইচ্ছা করে না। কিন্তু উঠতে ত হবেই, তোমার ক্ষিধে পাবে না প্রভু? তোমার আহারের পর একটু প্রসাদের প্রতীক্ষায় বসে থাকে দামোদর ও বংশীবদন।

এমনি করে করে দীর্ঘ দিন আর দীর্ঘ রাত কেটে যায়। সন্ধ্যেটা সেদিনের বড়ই বিষণ্ণ, বড়ই ম্লান। বর্ষণ ক্ষান্ত আকাশে চাঁদ উঠেছে জ্যোতিহীন শীর্ণ দেহ। আরতির শেষে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। জনবিরল গ্রাম্য পথে, কোথাও জল থৈ-থৈ করছে, কোথাও কাদা। বিষ্ণুপ্রিয়া মনে ভাবছেন, এখন তুমি কোথায়? তোমার চলার পথেও কি এমনি জল আর এমনি কাদা? কে পা দু'খানি মুছিয়ে দেবে ঘরে গেলে? কে দেবে শুকনো গামছা।

আবার বৃষ্টি, আকাশ কেবল কেঁদেই চলেছে আজ। জলের ছাট আসছে ঘরে, ভিজে যাচ্ছে ঘর, ভিজে যাচ্ছে শরীর। ভিজুক, উঠে আর জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত দেহ। শ্রীবিষ্ণুর পায়ের তলায় শুয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া। হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠে বসলেন—কে ডাকে?

—বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু এসেছ? প্রভু এসেছ?

—এসেছি, চল।

ধূপ ধূনোর গন্ধে ভরে গেল সারা বাড়ি, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল সব।

ভোর হল। নতুন জীবনে জেগে উঠল সারা পৃথিবী! কিন্তু বহু বেলা পর্যন্ত দ্বার খুলল না বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের। ভক্তেরা ধীরে ধীরে এসে দ্বার খুলে দাঁড়াল। কিন্তু এ কি! এ কি! মা কোথায়? স্তম্ভিত-ভীত বিস্মিত ভক্তদের চোখে বয়ে চলল অশ্রুর প্লাবন।

সহরে খবর পৌঁছুতে দেরি হল না। অগণিত জনস্রোত এসে লুটিয়ে পড়ল দ্বারপ্রান্তে। আকাশে, বাতাসে একটি রব শুধু ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, মা, মা, মাগো মা, জননী। তারপর বেদনা বিজড়িত চক্ষে অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে করজোড়ে নত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে, শেষ প্রণাম জানাল সকলে মাকে।

স্বামীর পাদুকা দুটি বক্ষে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রান্তে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন মা। এই ঘুম—এই চিরনিদ্রা! সৌম্য শান্ত শীর্ণ চেহারাখানিতে পরম পরিতৃপ্তির চিহ্ন। এই ঘুম, স্বামীর পদপ্রান্তে এই শেষ ঘুম। আর জাগবেন না মা।

শেষ